বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ভারতীয় বিজ্ঞানী মন

দেশী বিজ্ঞান—আজকের চিত্র

বিজ্ঞান বনাম ব্যক্তিমানস—

রামানুজন সত্যেন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র

যোজনার ফসল

সপ্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী 1984 এক টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

সপ্তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী 1984

চিঠিপত্র ☐ ভারতীয় বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক মন। প্রবীর রায় ☐ দেশী বিজ্ঞান—আজকের চিত্র। প্রফুল ভিদোয়াই ☐ দৃষ্টিকোণ। বিজ্ঞানমনস্কতা কি ☐ বিজ্ঞান বনাম ব্যক্তিমানস—রামানুজন-সত্যেন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্র। অভিজিৎ লাহিড়ী ☐ পরিক্রমা ☐ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-জীবিকা কোন পথে
সমীক্ষা : বিসিনোসিস ☐ রিপোর্ট

প্রচ্ছদ : অতি দাস

সম্পাদকমণ্ডলী

রবীন মজুমদার * রবীন চক্রবর্ত্তী * অভিজিৎ লাহিড়ী * সৌমেন গুহ * অসীম চট্টোপাধ্যায়

আমাদের উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানসম্মত ভাবনার প্রসার ☐ বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা ☐ বিজ্ঞানের জনস্বার্থবিরোধী চরিত্র ও অপপ্রয়োগের বিরোধিতা করা ☐ মানুষ সমাজ ও বিজ্ঞানের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা ☐ কাজের ক্ষেত্রে সুস্থ গণতান্ত্রিক বৈজ্ঞান্ত্রিক কাজের পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করা

গ্রাহক ও এজেন্টদের প্রতি

বছরের যেকোন সময় গ্রাহক হওয়া যায় ☐ বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার পাঁচ টাকা ☐ ডাক যোগে—সাত টাকা ☐ প্রাতিষ্ঠানিক চাঁদা—পঁচিশ টাকা ☐ বাংলাদেশের জন্য—ভারতীয় টাকায় দশ টাকা ☐ বিদেশী গ্রাহকদের চাঁদা বার্ষিক দশ ডলার ☐ এজেন্ট কমিশন দশ কপির উপর পঁচিশ এবং একশ কপির উপর তেত্রিশ শতাংশ ☐ এজেন্সীর জন্য নীচের ঠিকানায় লিখুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রতি সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় সেন্ট্রাল এভিনিউ ও বৌবাজার স্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে বৌবাজার পোস্ট অফিসের বিপরীতে 52/9C বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-700012 ঠিকানার দোতলায় ডি. এস. এন্টারপ্রাইজের ঘর। ☐ ডাকে যোগাযোগের ঠিকানা—অভিজিৎ লাহিড়ী, E C 106 সল্ট লেক, কলকাতা-700064

চিঠিপত্র

সকলের জানা দরকার

পত্রিকার বর্তমান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর 1983) সংখ্যা সম্পর্কে মতামত জানানোর উপযুক্ত মানুষ আছেন। আমি কেবল এইটুকুই বলব যে 'বি-ও-বি' আমার ভালো লাগে। আর এবারের সংখ্যাটি প্রতিটি লেখাপড়া জানা বাঙালী পরিবারে থাকার যোগ্য ও অক্ষরজ্ঞানহীন প্রতিটি মানুষের এর বক্তব্য জানা অত্যাবশ্যক বলে মনে হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় মজুমদার দিল্লী-110051

এখানেই দায়িত্ব শেষ হয় না

আপনাদের সাম্প্রতিক সংখ্যাটি (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর '83) পড়লাম। এতে মানসিক রোগের প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থার অসারতা ও নিপীড়ক ভূমিকা উদ্ঘাটিত হয়েছে। এ বিষয়ে এ জাতীয় লেখার পাঠক হবার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এখানেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। বিভিন্ন দেশের নানান সংগঠন এই অমানবিক ব্যবস্থার প্রতিরোধে কিভাবে কাজ করে চলেছেন তার অল্প কিছু পরিচয় এই সংকলনে দেয়া হয়েছে। এখানে কয়েকটি সংস্থা কাজ শুরু করলেও এখনো এটি কোন সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নেয়নি এবং জনসাধারণের মনের বদ্ধমূল ভুল ধারণাগুলিতে বিশেষ নাড়া দিতে পারেনি। ফলে যে ক'টি সংস্থা কাজ শুরু করেছে, তাদের উপর দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় এই বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে সমস্ত বিজ্ঞান-সংস্থা ও অন্যান্য সহমর্মী সংস্থাগুলির মাধ্যমে সেটির ব্যাপক প্রচার ঘটানো দরকার। সমস্ত বিজ্ঞান-সংস্থা যেন তার কর্মসূচীতে মানসিক স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেয় তার জন্য আবেদন জানানো উচিত। এছাড়া এই বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করা সম্ভব কিনা বিবেচনা করা উচিত।

'মন-অবদমন-দাসত্ব' প্রবন্ধটির একটি অংশের বিষয়ে আমার মন্তব্য জানিয়ে শেষ করছি। এই সুলিখিত প্রবন্ধে এক স্থানে বলা হয়েছে "নারীরা তাদের বাচ্চা মেয়েদের হুবহু একই রকম দাসত্বকে মেনে নেবার ট্রেনিং দেয়, বাচ্চা ছেলেদের শেখায় প্রভুত্ব আর যথেচ্ছাচার করা।" প্রবন্ধটির মূল ভাবের বিরোধিতা না করেও বলা যায় যে নারী তার পুত্রকে পরোক্ষভাবে নিপীড়ক হয়ে উঠতে উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হয়না, সে স্বয়ং অনেক ক্ষেত্রে নিপীড়কের (শাশুড়ী বা ননদ ইত্যাদি) ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এর সঙ্গে র‍্যাগিং-এর শিকার হওয়া ছাত্রের পরবর্তীকালে নিজে র‍্যাগি-এর মাধ্যমে নবীন ছাত্রদের নিপীড়ন করার মানসিকতার মিল পাওয়া যায়। আমার ধারণা এই প্রসঙ্গটির আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখ ঘটলে ভাল হত।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুর, হাওড়া

'মন' ইস্যুতে মনই নেই

আপনাদের পত্রিকার নিয়মিত পাঠক আমি নই। অক্টোবর সংখ্যা 'অন্বেষা'য় ঘোষণা দেখে মন মনোরোগ ইত্যাদি বিষয়ক সংখ্যাটি সংগ্রহ করি। বলতে বাধ্য হচ্ছি সংখ্যাটিতে বিষয়ের চমক যতখানি ছিল সেই অনুযায়ী প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। যে 'মন' নিয়ে এই ইস্যু সে বিষয়েই কোন আলোকপাত নেই। এটা একটা অসম্পূর্ণতা বলে মনে করি। তবে যদি এমন মনে করে নিয়ে থাকেন যে পাঠকরা 'মন'-এর মত সাধারণ (!) একটা বিষয় নিশ্চয় জানেন—তাহলে আমার বলার কিছু নেই।

আর একটা কথাও না বলে পারছি না যে, সব লেখাতেই কেমন একটা বিদ্যা জাহিরের মনোভাব দেখা গেছে, বাস্তব ঘটনা নিয়ে বিশ্লেষণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। 'পাগল ভাবনা' পড়ে মনে হল, সত্যিই পাগল যেন কেউ হয় না—পুরোটাই রাষ্ট্র বা অন্যদের ষড়যন্ত্র। পাগলের চিকিৎসাব্যবস্থার সবটাই যেন নিপীড়নের হাতিয়ার। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

এত সমালোচনা করছি দেখে রাগ করছেন হয়তো। আসলে চেয়েছিলাম আরও অনেক কিছু। সেই কারণেই মনের ভাবটা জানালাম। এই বিষয় নিয়ে আরো রচনা প্রকাশ করবেন আশা রাখি। কারণ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

অমিতাভ দাস নৈহাটি

পাভলভ ইনষ্টিটিউটের নাম নেই কেন

'মন-মনোরোগ-মনোবিজ্ঞান' সংক্রান্ত সংখ্যাটি পড়ে একটি বিষয়ে খটকা লাগায় এই পত্র। দেশ বিদেশের অনেক সাইকিয়াট্রিক অর্গানাইজেশনের পরিচিতি দিয়েছেন। কিন্তু সেই তালিকায় আমাদের অনেকের পরিচিত একটি সংগঠনের নাম নেই দেখে বিস্মিত হলাম। সেটা হল শ্রদ্ধেয় প্রবীণ ডাক্তার ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পাভলভ ইনষ্টিটিউট'। যতদূর শুনেছি ওনারাও কিছু কিছু কাজকর্ম করে থাকেন।

পল্টু চক্রবর্তী মধ্যমগ্রাম

[অসাবধানতাবশত কলকাতার পাভলভ ইনস্টিটিউটের পরিচিতি বাদ পড়ায় আমরা দুঃখিত। আমাদের এই ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ায় পত্রলেখককে ধন্যবাদ জানাই। —সঃ মঃ / বি-ও-বি]

পাগল 'চিকিৎসায়' ব্যবহৃত ওষুধ

'পাগল ভাবনা' লেখাটিতে জানার মত অনেক কিছু আছে। কিন্তু চিকিৎসার নামে যে সব ওষুধ দেওয়া হয় তার কিছু দেখলাম না। এইসব ওষুধের ভালমন্দ সম্পর্কে আমি জানতে আগ্রহী।.....

প্রীতি দাস হাওড়া

[এই বিষয়ে একটি আলোচনা আগামী সংখ্যায় থাকছে। —সঃ মঃ / বি-ও-বি]

ভারতীয় বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক মন

প্রবীর রায়

এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী সমাজের বেশীর ভাগ সভ্যরা নিজেরাই পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোভাব পোষণ করেন না। সুতরাং সর্ষের মধ্যেই ভূত।

কয়েকদিন আগে সংবাদপত্রে এক বিচিত্র খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতীয় মহাকাশ অনুসন্ধান সংগঠনের কর্মীদের সরকারী আবাসগুলি নিয়ে যে উপনগরী গড়ে উঠেছে, সেখানে কয়েকটি শিশু অনির্ণীত কোন রোগে প্রাণ হারায়। এর থেকে ঐ উপনগরীর বাসিন্দারা (যাঁরা সকলেই বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানকর্মী) মনে করেন যে, এ দুষ্কর্মটি ঘটিয়েছে নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট আত্মা। সেই আত্মার বিতাড়নের জন্যে ওঁরা এক বিশেষ পুরোহিতকে এনে সাড়ম্বরে যজ্ঞ এবং স্বস্ত্যয়ন করান। বাস্তব জীবনে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কি চমৎকার নিদর্শন!

স্বাধীন ভারতের ছত্রিশ বছরের ইতিহাসে এদেশের বিজ্ঞানীসমাজের প্রসার ও পরিবর্ধন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শোনা যায়, আমাদের বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী নাকি বিশ্বে তৃতীয় বৃহত্তম, চীনের থেকেও বৃহত্তর—ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিজ্ঞানী বলতে যদি বিজ্ঞানের ডিগ্রীধারী এবং বৈজ্ঞানিক সংস্থার বেতনভোগী সমস্ত লোককে বোঝায়, তাহলে হয়তো এ সব দাবীতে আংশিক সত্যতা আছে। অন্ততপক্ষে সরকারী বা অনুদানপ্রাপ্ত বিজ্ঞানাগার, গবেষণাকেন্দ্র, বিজ্ঞানবিভাগযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আই-আই-টি ইত্যাদি তো অনেক হয়েছে এবং হচ্ছে—আর তাদের কর্মীরা দেশের জনসংখ্যার স্বল্পাংশ হলেও এমনিতে সংখ্যায় নেহাৎ নগন্য নন। কিন্তু এ যদি সত্য হয় তাহলে, এই বিশাল বিজ্ঞানী সমাজের অস্তিত্ব সত্ত্বেও আমাদের দেশের সাধারণ জনমানসে তো দূরের কথা, অধিকাংশ নেতাদের বা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা তথা কথাবার্তায় যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের ছায়ামাত্রও দেখা যায় না, এটা বিশেষ শঙ্কার কথা নয়কি? অবশ্য এই প্রশ্ন যথেষ্ট গভীর ও জটিল। আমাদের দেশের ইতিহাস, সামগ্রিক দারিদ্র্য ও অনুন্নতি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক স্তরভাগ, নেতৃবর্গের শ্রেণীস্বার্থ—অনেক কিছুই বিশ্লেষণ করতে হবে এর যথাযথ উত্তর পেতে হলে। আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিধি সেই তুলনায় অনেক সীমিত। একথা সকলেই মানবেন যে, মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী মনোভাব সঞ্চারিত করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের নিজেদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণভাবে আহরণ করা। বস্তুত, এটিকে একটি বাধ্যতামূলক শর্ত হিসেবে ধরা যায়। আমার বক্তব্য এই যে, এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীসমাজের বেশীর ভাগ সভ্যরা নিজেরাই পূর্ণ বৈজ্ঞানিক মনোভাব পোষণ করেন না। সুতরাং সর্ষের মধ্যেই ভূত।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি কৌতূহলী ও যুক্তিবাদী মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ এক স্থায়ী মনোভাব। বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ ক'রে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেই তথ্যসমগ্র বিষয়ানুগ এক তত্ত্বের কাঠামোতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞান চায় প্রকৃতির নিয়ম ও প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যের কার্যকারণ সম্পর্কটি বুঝতে। কয়েকটি অল্পসংখ্যক সূত্রকে স্বতঃসিদ্ধ প্রকল্প হিসাবে ধরে তাদের উপরে ভিত্তি করে এক একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রচিত হয়। পৌনঃপুনিক পরীক্ষায় প্রমাণিত কোন সঠিক পর্যবেক্ষণের সংগে যদি কখনো কোন তত্ত্বের সংঘাত ঘটে, তাহলে সেই তত্ত্ব বা প্রাসংগিক কোন সূত্রকে বর্জন করে নতুন সূত্র বা তত্ত্ব রচনা করতে হয়। এই নতুন তত্ত্বের সাহায্যে অধিকতর সংখ্যার তথ্য ব্যাখ্যা করা যায়। এইভাবেই এগিয়ে চলে বিজ্ঞানের জয়রথ। সব গৃহীত তথ্যের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা এই মুহূর্তে সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানতত্ত্বের সামগ্রিক কাঠামোর ভিত্তিতে একদিন হবে—এটাই বিজ্ঞানের আদর্শবাদ। এবং প্রকৃতির তথা জীবনের সব ঘটনাবলীকে এই কাঠামোর ভিত্তিতে বোঝার চেষ্টা করাটাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। (বাস্তব ঘটনার বহির্ভূত প্রশ্ন—যেমন আত্মা বা ভগবানের অস্তিত্ব—বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় বলে বিজ্ঞানীর কাছে অপ্রাসংগিক)। এই দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব বিজ্ঞানাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বাহিরের জীবনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে না—যদি কোন পার্থক্য থাকে তবে তা পরিমাপে মাত্র। জড়বস্তু, শক্তি ও বল, জীবিত উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগৎ এবং চিন্তাশীল মানুষ সকলেই এই কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশ, স্বয়ং বিজ্ঞানীও এর অংশবিশেষ। কাজেই আংশিক ভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা যায় না। এমন দাবী করা যায় না যে, মাত্র কতগুলি ঘটনাই বিজ্ঞানের কাঠামোর ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়—অন্যদের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক বিশ্বাস বা সংস্কার কিংবা কোন পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ বা কোন মুনি-ঋষি-যাজক অথবা মডার্ন গুরুর বাণীই প্রযোজ্য এবং সেসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞান অপারগ। অন্যথা, আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে, যাঁরা এরকম ভাবেন বা দাবী করেন—তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক নয়।

ভারতের বিজ্ঞানীসমাজ বলতে আমরা কি বুঝি? এদেশে অপেশাদারী বৈজ্ঞানিক যে একেবারে নেই তা নয়, তবে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম। পরিসংখ্যানের খাতিরে বিজ্ঞানসম্পর্কিত পেশায় (শিক্ষণ বা অধ্যাপনা, গবেষণা বা ঐ সাহায্যার্থে যন্ত্রসংক্রান্ত কারিগরি ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি) নিযুক্ত সকলকেই এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত করা যাক। এঁদের মধ্যে যাঁরা স্বল্প বেতনের কারিগর বা কর্মচারী, তাঁরা অনেকেই প্রথাগতভাবে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভ করেন নি—সেরকম কোন উচ্চশিক্ষারই সুযোগ হয়তো পাননি। বৃত্তিটা তাঁদের কাছে একমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন লাভের উপায় হিসেবেই গ্রাহ্য—জীবনদর্শনের খোরাক হিসেবে নয়। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি এই শ্রেণীর অন্যান্য আফিসের বা কারখানার কর্মীদেরই মত। এঁদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ও বর্ধনের ব্যাপারে সচেষ্ট অবশ্যই হতে হবে, কিন্তু যেহেতু এঁরা নিজেদের বিজ্ঞানী বলে জাহির করেন না, এঁদের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দুঃখজনক হলেও ভারতের বর্তমান

সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিস্ময়কর নয়। সুতরাং এঁদের নিয়ে আপাতত মাথা না ঘামিয়ে আলোচনা করা যাক সেই সম্প্রদায়কে নিয়ে—যাঁরা তথাকথিতভাবে উচ্চশিক্ষিত (অর্থাৎ অন্তত এম এস সি পাশ), উচ্চ বা মাঝারি বেতনভোগী এবং নিজেদের বিজ্ঞানী বা ইংরেজিতে সাইন্টিস্ট্ বলে মনে করেন। আমি এই দলে পড়ি। কর্মসূত্রে ও সামাজিক জীবনে এঁদের সংগে মেলামেশা করি। গত এক দশকের উপর ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞানাগারে, গবেষণাকেন্দ্রে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই সম্প্রদায়কে পর্য্যবেক্ষণ করে আসছি। আমার কাছে নথিবদ্ধ পরিসংখ্যান নেই, তবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, এঁদের মধ্যে যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি খুব কম লোকেরই আছে। বিজ্ঞানশিক্ষা এঁদের অধিকাংশের মনের উপর একটা বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রলেপ দিয়েছে বটে, কিন্তু অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। সেখানে এখনো শৈশবে বা কৈশোরে আহৃত অবৈজ্ঞানিক নানা সংস্কার ও দুর্বলতা জাঁকিয়ে বসে আছে। পেশাগত কাজের বাইরে এঁরা সেইসব বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে থাকেন। এঁরা কাজের দিনে দশটা থেকে পাঁচটা অবধি বৈজ্ঞানিক মনটিকে রসায়নবিদের অ্যাপ্রনের মত পরিধান করেন। আবার অফিসের ধড়াচূড়ো ছাড়ার সাথে সাথে ওটিকেও পরিহার করেন।

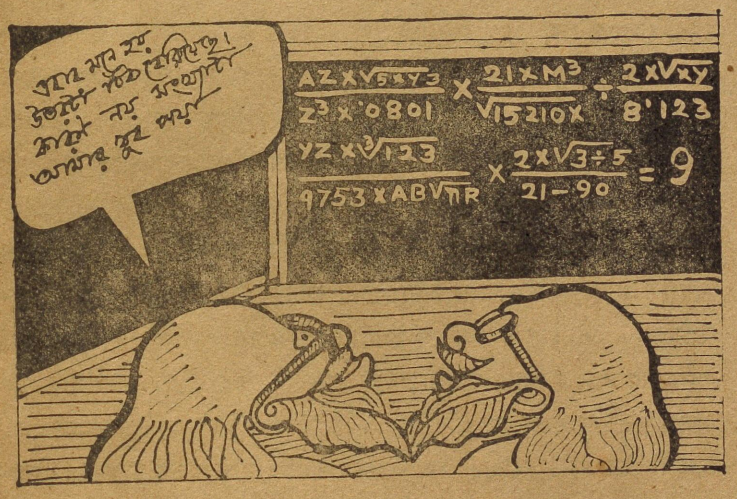

উপরের বক্তব্যের সমর্থনে প্রথমে কয়েকটি চমকপ্রদ উদাহরণ দিই। আগে খুব উচ্চস্তরের বিজ্ঞানীদের দিয়ে শুরু করা যাক, পরে নাহয় আরো সাধারণদের কথা বলা যাবে। (1) ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের একজন প্রাক্তন নির্দেশকের কথাই ধরুন না। স্বনামধন্য লোক, আজ অবসরপ্রাপ্ত হলেও একদিন নিত্যই তাঁর নাম সংবাদপত্রে দেখেছেন। এই ব্যক্তি শুধু যে শ্রীসাঁইবাবার শিষ্য তাই নন, দেশময় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান কিভাবে শ্রীসাঁইবাবা নানা অলৌকিক ঘটনাবলী সম্পন্ন করেন ও কিভাবে তেনার আশীর্বাদী বিভূতি দিয়ে দুরারোগ্য অসুখের নিরাময় হয়। (2) একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী আছেন, যাঁর প্রসিদ্ধি অত্যন্ত সংগত কারণেই বিশ্বজোড়া। ইনি স্বদেশে ও বিদেশে উচ্চপদে কাজ করেছেন ও করেন। নিজের বিষয়ে মৌলিক গবেষণা ছাড়াও ইনি নানা দার্শনিক ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেন। ভারতীয় দর্শনে এঁর প্রগাঢ় অনুরাগ এবং তা প্রমাণ হয় এঁর বৈজ্ঞানিক লেখায় পতঞ্জলির উদ্ধৃতি থেকে। ইনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষ মন্ত্রবলে "আকাশগমন" করতে পারে—অর্থাৎ কিনা পদ্মাসনে বসে ভূপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বে উঠে ভেসে বেড়াতে পারে। এ বিষয়ে ওঁর প্রকাশ্য বক্তৃতা আমি শুনেছি—তাতে যুক্তি ও প্রমাণের চাইতে বিশ্বাস ও আবেগের বন্যাই বেশী। (যেমন উনি দাবী করেন যে, মানুষ ধ্যানযোগে এমন ঐশী শক্তির বলক্ষেত্র তৈরি করতে পারে যার জোর মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে বেশী।) এঁর উৎসাহে একসময় মাদ্রাজের সন্নিকটে এক "আকাশগমন শিক্ষাকেন্দ্র" স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে ছ' সপ্তাহের প্রশিক্ষণ নিলে নাকি অল্পস্বল্প আকাশগমন করা যেত। তবে দুঃখের বিষয়, আপনি বা আমি সে শিক্ষা নিতে পারতাম না। ওটা ছিল শুধুই বিদেশীদের জন্যে এবং প্রবেশমূল্যে ছিল ডলারে অগ্রিম প্রদেয়। (3) আরেকজন বহুমুখী তাত্ত্বিক পদার্থবিদের কথা বলি। এঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা এত বেশী যে সে সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে। সেই সুনামে জাতীয় পদার্থবিজ্ঞান মহলে ইনি একজন হোমড়া-চোমড়া ব্যক্তি। এই ভদ্রলোক মহর্ষি মহেশ যোগীর শিষ্য। "মহর্ষি আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ে"র হয়তো নাম শুনে থাকবেন, সুইজারল্যান্ডে এদের বিশাল ভবন আছে। তার বার্ষিকী পুস্তিকার একটি আলোকচিত্রে দেখা যাবে যে, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানী আসীন মহর্ষির পাশে দাঁড়িয়ে স্বহস্তে চামরব্যজন করছেন। ঐ "বিশ্ববিদ্যালয়ে"র একটি "গবেষণা-পত্রিকা" আছে। সেখানে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে উনি লিখেছেন যে, মানুষের চেতনা একটি অতিক্ষেত্র (সুপারফিল্ড) এবং ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে বৈদিক ধ্যানধ্যারণা, মহর্ষির চিন্তাধারা ও আধুনিক পদার্থতত্ত্বের নবতম আবিষ্কার অতিপ্রতিসাম্য (সুপারসিমেট্রি) সব একাকার হয়ে এক যুগান্তকারী অতিবিজ্ঞানের (সুপারসায়েন্স) সূচনা করেছে। আর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কেউ কেউ হয়তো প্রতিবাদ করবেন যে, উপরের নিদর্শনগুলি বিশেষ বিচ্যুতি বা ব্যতিক্রমমাত্র—সাধারণভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নিশ্চয়ই এরকম নন। এই প্রতিবাদ আমি মানতে পারছি না। যে কোন সর্বভারতীয় গবেষণাকেন্দ্রে যান। দেখবেন বিজ্ঞানীদের অনেকেই কপালে লাল বা সাদা ফোঁটা পরে কাজে আসেন। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানবেন যে, প্রত্যূষে কৃষ্ণমূর্তি বা শিবলিঙ্গ পূজা সমাপন না করে তাঁরা প্রতিদিনের গবেষণা শুরু করার কথা ভাবতে পারেন না, কারণ ঐ ফোঁটা না পরলে প্রকৃতির প্রকৃত রূপ তাঁদের সামনে উদ্ঘাটিত হবে না। বিভিন্ন সংস্থার বিজ্ঞানীদের জামা বা বুশসার্টের আস্তিন তুলে দেখুন। মাদুলি, তাবিজ, কবজ ইত্যাদি সংখ্যায় খুব কম দেখবেন না। কেউ কেউ হয়তো লাজুক-ভাবে ঠাকুমা-দিদিমার দোহাই দেবেন। কিন্তু আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, ঐ বৃদ্ধারা প্রয়াত হলেও এঁদের বাহু থেকে ওগুলি খুলবে না। এক তরুণ বিজ্ঞানী পরিণীত হতে চলেছেন, সব ঠিকঠাক, শেষ পর্যন্ত কোষ্ঠীর অমিলের জন্যে পিছিয়ে গেলেন, কারণ—বিবাহিত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য নাকি ঐ কোষ্ঠীর উপরে নির্ভর করছে। গবেষকের রুদ্রাক্ষ পরিধান, মহিলা বিজ্ঞানীর হারের লকেটের মধ্যে গুরুদেবের প্রণামী ভস্ম বহন, খ্যাতনামা বিজ্ঞানের অধ্যাপকের

অঙ্গুরীয়তে জ্যোতিষীদত্ত প্রবাল ধারণ—আর কত বলব ?

এবারে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীদের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ দিই। আমি এক প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণী ধাতুবিদ্‌কে চিনি। প্রতিদিন সকালে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপটি চালানর আগে তিনি ওটিকে অল্পক্ষণ পুজো করে নেন। বেশী কিছু নয়—দুটো বেলপাতা, একটি গাঁদাফুল, এক-আধটা মন্ত্র। আমি প্রশ্ন করেছিলাম "এর কি প্রয়োজন ?" উত্তর—"ঈশ্বরের প্রকাশ সবেতেই এমনকি মাইক্রোস্কোপেও। একে না পুজো করলে এর থেকে সুফল পাব কি ক'রে ?" এরপরে একজন বাঙালী সহকর্মীর গল্প। ইনি নক্ষত্রতত্ত্বের উপরে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এঁর গবেষণালব্ধ ফলাফল যে খাতায় লিপিবদ্ধ করেন তার শিরোনামায় ইনি "জয় মা" লিখে রাখেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন, "আমাদের বংশের সকলেই কালীর ভক্ত, তাঁকে স্মরণ না করে গবেষণা চালাব কি করে ? যদি কোন খাতায় তাঁর নাম না লিখি, তাহলে সে খাতার অঙ্কে ভুল হবে—আমি নিশ্চিত জানি।" বিজ্ঞানীদের এ ধরনের অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি শুধু যে এক বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা নয় কিন্তু। সেদিন এক মুসলমান সহকর্মী পরিসংখ্যক বলবিদ্যার আলোচনার মধ্যে হঠাৎ ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে গেলেন। কি ব্যাপার ? ওঁর পুত্রের অসুস্থতার জন্যে পীরের দরগায় মানত করেছেন, তার শিন্নি বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। এক খৃষ্টান অধ্যাপককে আমি জানি, যিনি মাহাজাগতিক রশ্মির উপরে গবেষণা করে খ্যাতনামা হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, যীশু সত্যিই হাত বুলিয়ে অন্ধ নারীকে দৃষ্টিদান করেছিলেন। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চাইলে তিনি বল্লেন, "যিশু ঈশ্বরের পুত্র, তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরে।" এদেশে গণিতবিদ্যায় যে জাতীয় কেন্দ্র আছে, আমি জানি সেখানকার অনেক গাণিতিক পঞ্জিকায় দিনক্ষণ দেখে ট্রেনে চাপেন। গ্রহ-উপগ্রহ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বলবিদ্যার এমন গবেষকদের চিনি, যাঁরা 1980 সনের পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় অমঙ্গলাশঙ্কায় উপবাস করেছিলেন। একজনকে প্রশ্ন করেছিলাম, "কেন করলেন ? জানেন তো এটা অবৈজ্ঞানিক ?" উত্তর পেলাম "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"। ভদ্রলোকের শেক্সপীয়রজ্ঞান প্রশংসনীয় কিন্তু ওঁর মানসিকতাকে বৈজ্ঞানিক বলা যায় না। এরকম অপর্যাপ্ত ঘটনার উল্লেখ করা যায় এবং এরা এক ভাসমান তুষারস্তূপের শীর্ষমাত্রের সূচক। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যাটি অনেক বেশী ব্যাপক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপাতদৃশ্য নয়। সুতরাং উদাহরণ ছেড়ে মূল বক্তব্যে ফেরা যাক। আমাদের দেশে বিজ্ঞানকে বৃত্তিরূপে বেছে নিয়েছেন এমন ব্যক্তিরা সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করেছেন, কিন্তু এদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ বিকাশ হয়নি। বিবিধ সংস্কারের বেড়াজালে ঘেরা অবৈজ্ঞানিক মনোভাব এঁরা অনেকেই পোষণ করছেন। উন্নত দেশগুলির বৈজ্ঞানিক মহলে এ জাতীয় মনোভাব কিন্তু সত্যিই বিরল। কাজেই এটা বোধহয় আমাদের দেশের একটা বৈশিষ্ট্য। হয়তো ভারতীয় দর্শনে মায়াবাদের একাধিপত্যের এ এক প্রভাব। যারা কণাদকে বিদ্রূপে করেছিল স্তব্ধ, চার্বাকের গ্রন্থাবলী করেছিল ভস্মীভূত—তাদেরই ঐতিহ্যের ফলশ্রুতি এ। এই প্রসংগে আরেকটি কথা উল্লেখ্য। একথা অনস্বীকার্য যে, মনোবিজ্ঞান ও স্নায়ুবিদ্যাতে আমাদের জ্ঞান আজও খুব ক্ষীণ ও স্বল্প। সেজন্য মানুষের অনেক মনস্তাত্ত্বিক বা স্নায়বিক অভিজ্ঞতার হয়তো সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনো সম্ভব হচ্ছে না। তবে সেটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে সংস্কারে বিশ্বাস বা অবৈজ্ঞানিক মনোভাব পোষণের পক্ষে দার্শনিক সমর্থন জানান অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানীই। আসলে আধুনিক বিজ্ঞান প্রতীচ্যের উত্তর-রেনেশাঁয় শিল্পনির্ভর সভ্যতারই অবদান এবং মূলত এর দর্শন বস্তুবাদী। তত্ত্ব ও তথ্যের যে ঘাত-প্রতিঘাতের উপরে নির্ভর করে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, তাতে বারংবার হেগেলীয় দ্বন্দ্বাত্মকতাই দ্যোতিত হয়। এইজন্যই মার্ক্স দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকে আখ্যা দিয়েছেন 'বৈজ্ঞানিক'। সেই তুলনায় ভারতীয় দর্শনে রয়েছে মায়াবাদের প্রাধান্য ; স্বয়ং শংকরাচার্য বস্তুর অসারত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,জগৎ প্রপঞ্চময় এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মায়ামাত্র। ভারতের মায়াবাদী বুদ্ধিজীবীরা এখনো অন্তরে অন্তরে বিজ্ঞানের বাস্তবমুখী দর্শনকে গ্রহণ করতে পারে নি এবং এক ধরনের মায়ার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন আমাদের অধিকাংশ বিজ্ঞানীরাও। (অবশ্য পশ্চিমের সব বিজ্ঞানীই ঠিক বস্তুবাদী নন, কিন্তু তাঁরা নিদেনপক্ষে কান্টীয় ভাববাদের অনুসারী, অন্তত তাঁদের জীবনদর্শনে মায়ার কোন স্থান নেই।) সেটা এঁদের সংস্কারাবলী ও অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এক অন্যতম কারণ। তাছাড়া এঁরা অধিকাংশই ভারতের যে সামাজিক শ্রেণী থেকে উদ্ভূত, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই শ্রেণীর কাছে যুক্তিনির্ভর তথ্যশীল বস্তুবাদের চাইতে আবেগপ্রধান মায়া ভিত্তিক অধ্যাত্মবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদ অনেক বেশী সুবিধাজনক। বিজ্ঞানকে এক জীবনদর্শন রূপে না নিয়ে কেবল এক প্রায়োগিক বৃত্তি হিসেবে গণ্য করলে তাকে শুধু নিজশ্রেণীর পার্থিব উন্নতিকল্পে নিয়োগ করা এবং নিম্নতর শ্রেণীর দক্ষতর শোষণের হাতিয়ার বানান সহজ হয়ে ওঠে।

অবশ্য আমি মনে করি—এই অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির প্রতিকার সম্ভব। সম্প্রতি এদেশের কয়েকজন গণ্যমান্য বিজ্ঞানী "বৈজ্ঞানিক মেজাজ" নিয়ে মেতে উঠেছেন। এটা হয়তো একটা ক্ষণস্থায়ী ফ্যাশনমাত্র এবং এ নিয়ে কিছু কর্তাব্যক্তির ব্যস্ততার মধ্যে পোশাকী আড়ম্বরই বেশী। তবুও এই প্রসংগে অনেকে যা বলছেন—তার মধ্যে বস্তুনিষ্ঠা ও যুক্তিবাদ সম্পর্কে কিছু বিচক্ষণ মন্তব্য দেখা যায়। আরেকটি আশার কথা বলতে পারি। যে তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অধ্যাপনা বা গবেষণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন, তাঁদের মধ্যে যেন তাঁদের বয়স্ক সহকর্মীদের তুলনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বেশী দেখা যাচ্ছে। এমনিতেই বিজ্ঞানীরা স্বভাব-কৌতূহলী এবং যুক্তিনির্ভর—নইলে তাঁরা বিজ্ঞানকে বৃত্তি হিসেবে বেছে নিতেন না। কাজেই বারংবার আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে এঁদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার করা যায়—যদি এদিকে সুনির্দিষ্ট প্রয়াস হয়। আনন্দের কথা, আজ এদেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের অনেকে গণবিজ্ঞান আন্দোলন করতে চাইছেন। কেরলে ও মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলনের খানিকটা সাফল্য দেখা দিয়েছে—পশ্চিমবঙ্গেও চেষ্টা চলছে। যখন দেখি বোম্বাইয়ের মত স্বার্থান্বেষী ও ব্যবসায়ী শহরেও কত তরুণ বিজ্ঞানী সোৎসাহে এই আন্দোলনে নামছেন, তখন নৈরাশ্য কাটিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠি। এঁদের প্রতি আমার অনুরোধ—নিজেদের সহকর্মীদের বৈজ্ঞানিক মনোভাব বর্ধনেও ব্রতী হোন, তাঁদের অবৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে উঠুন।

[প্রবীর রায় টাটা ইনস্টিটিউট অভ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে গবেষণা ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত।]

দেশী বিজ্ঞান—আজকের চিত্র

প্রফুল ভিদোয়াই

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপারে 'হাতুড়ে মনোভাবই' ভাল।

মাস তিনেক আগে শ্রীমতী গান্ধীর CSIR ল্যাবরেটরীগুলি সম্পর্কে সমালোচনা এবং অফলপ্রসূ এইসব সংস্থা বন্ধ করে দেবার প্রচ্ছন্ন হুমকির ফলে যে ধূলিঝড় উঠেছিল তা এখন থিতিয়ে এসেছে। CSIR এখন তার কাজকর্ম চাঙ্গা করতে উঠেপড়ে লেগেছে এবং দু'একটি উচ্চস্তরের কারিগরী ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেছে, যেমন—মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স, সমুদ্রবিজ্ঞান ইত্যাদি।

'বিজ্ঞানের উৎকর্ষ' বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানিয়েছে। এবং সরকার বিদেশে বসবাসকারী প্রতিভাধর বিজ্ঞানীদের দেশে ফিরে আসতে আকৃষ্ট করার অন্যতম পরিকল্পনা হিসেবে একটি 'বিজ্ঞান নগরী' স্থাপনের সংকল্প ঘোষণা করেছে। এই বিজ্ঞান নগরী তথা 'উন্নতমানের' বিজ্ঞানকেন্দ্রের জন্য খরচ হবে একশ পঁচিশ কোটি টাকা এবং ডিপার্টমেন্ট অভ সায়েন্স এন্ড টেক্নোলজীর ভেতরের খবর, এটি গঠিত হবে 'রায় বেরিলি'তে।

খুব চট করে ধরা না পড়লেও এই তিনটি ঘটনার মধ্যে একটি সাধারণ সত্য নিহিত রয়েছে। এটা আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতির দিক নির্দেশ করে। প্রকান্ড বড় বড় ডিপার্টমেন্ট ও রিসার্চ কাউন্সিলের অধীনে উচ্চস্তরের কারিগরী এবং অর্থবহুল ও মৌলিক বিজ্ঞানের প্রতিই এই নীতির ঝোঁক বেশী। প্রচ্ছন্নভাবে সরকারী স্বীকৃতিও এই যে, ছোটখাটো প্রয়োগভিত্তিক গবেষণার পরিবর্তে চটকদার বিজ্ঞান ভিত্তিক চর্চায় ভুল কিছু নেই। এই দুয়ের সুস্থ সমন্বয় সাধন নয় বরং দ্বিতীয়টির মানোন্নয়ন করাটাই যেন প্রধান সমস্যা। ধরেই নেওয়া হচ্ছে, ভারতের প্রয়োজনের পক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গীটিই উপযুক্ত এবং সঠিক।

গভীর অনুসন্ধান নেই

এই ধারণাটি কিন্তু আদৌ প্রশ্নাতীত নয়। অথচ কখনোই এটিকে খুঁটিয়ে বিচার করা হয়নি। উচ্চস্তরের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আর সাধারণ প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞানের মধ্যকার প্রশ্নটিও বিবেচিত হয়নি ঠিকমত। এই দুইয়ের ভিতরকার পারস্পরিক সম্পর্কটা খুব একপেশে ভাবে দেখা হয়েছে। দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে বাজেটের যে অংশ ব্যয় হয় কমপক্ষে তার পাঁচ ভাগের চার ভাগ চলে যায় এই ধরনের উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ধারায়—যেমন 'নিউক্লিওনিক্স', 'মহাকাশবিজ্ঞান', 'ইলেকট্রনিক্স', অথবা পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, এবং রসায়নবিদ্যার মৌলিক ও তত্ত্বগত গবেষণায়। প্রায় অর্ধেকই যায় নিউক্লিয়ার শক্তি এবং মহাকাশ গবেষণার কাজে। অথচ চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমাজের যে উপকার সাধন করছে তা' তুলনায় এতই নগণ্য যে এ সবের পেছনে এত টাকা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকেদের পরিশ্রমের কোন অর্থই হয় না।

দৃষ্টান্ত হিসেবে নিউক্লিওনিক্সের ব্যাপারটা ধরা যায়। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ লাভ বলতে তিনটে স্টেশনে (তারাপুর, রাজস্থান ও মাদ্রাজ) পাঁচটা রিয়্যাক্টরের বেশী কিছুই করা সম্ভব হয় নি। এর মধ্যে তারাপুরে যে দুটো রয়েছে সেগুলো আমেরিকানরা এমনভাবে তৈরী করেছে যে আমাদের বোতাম টেপা ছাড়া বিশেষ কিছুই করতে হয় না। ফলত, এর ভেতর ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্দের শেখার ব্যাপারটা প্রায় নেইই। এগুলো যে কারিগরী নীতির ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে প্রযুক্তিগত ভাবে তা' ডিপার্টমেন্ট অভ অ্যাটমিক এনার্জী কর্তৃক গৃহীত প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ভিত্তিক ছক থেকে অনেক আলাদা। এর ফলে তারাপুর আসলে আমেরিকার উপর (এবং এখন ফ্রান্সের ওপরও) ভারতের নির্ভরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। কেননা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম জ্বালানী ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ জোগাড় করতে হবে ঐসব দেশ থেকেই।

আর যে তিনটি রিয়্যাক্টর রয়েছে সেগুলো কানাডার ডিজাইন করা—এখন পুরনো ও বাতিল হয়ে গেছে। ডিপার্টমেন্ট অভ অ্যাটমিক এনার্জি-কে এখন এগুলোর উন্নতি সাধন করতে হবে। ম্যাপ—1 রিয়্যাক্টর এখনও থিতু হয় নি। র‍্যাপ—1 ও 2-এর অবস্থা এতই করুণ যে গড়পড়তা পনের দিনে একবার ক'রে বন্ধ করে দিতে হয়। ডিপার্টমেন্ট অভ এ্যাটমিক এনার্জি-র ভারী জল সংক্রান্ত প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা হল, এর প্রযুক্তিগত দিকটাই এখনো আয়ত্ত করতে পারেনি ডিপার্টমেন্ট অভ এ্যাটমিক এনার্জি।

এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, যে এইসব দীর্ঘসূত্রতা ও ব্যর্থতার কারণ খুব গভীর। সামান্য পরিমাণ প্লুটোনিয়াম ছাড়া নিউক্লিয়ার শক্তি পরিকল্পনার একমাত্র প্রত্যক্ষ সুফল হল বিদ্যুৎ। কিন্তু এই পরিকল্পনা খাতে যে ব্যয় হয়েছে তা' যদি কয়লা নির্ভর তাপবিদ্যুৎ শক্তির জন্য নিয়োজিত হত তবে এদেশে কুড়িগুণ বেশী বিদ্যুৎ তৈরী করা সম্ভব হত।

টেলিযোগাযোগ ও টেলিভিশনের ক্ষেত্রে মহাকাশ প্রকল্পের সুফলগুলো নগণ্য নয় ঠিকই। কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ জাগে—ইনস্যাট-1 বি'র পেছনে যে বিশাল পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়েছে তার তুলনায় টি-ভি ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে প্রাপ্ত মোট সামাজিক উপকারের পরিমাণ কি খুবই অল্প নয় ?

অসংলগ্ন প্রকল্প

ইলেক্ট্রনিক্সের ক্ষেত্রে সরকারী নীতি পশ্চিমের দেশগুলি ও জাপানের উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি করেছে অথবা এই নির্ভরশীলতা বজায় রাখতে ও বাড়াতে সহায়তা করেছে। বাজারে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয় না এমন ধরনের কিছু যন্ত্রাংশ তৈরী, আর অন্য জায়গায় তৈরী যন্ত্রাশ জুড়ে ইলেকট্রনিক যন্ত্র বানানো—শুধু এই কাজের উপযোগী শিল্পই গড়ে উঠেছে এতদিনকার গবেষণা ও উন্নয়নমুখী প্রচেষ্টা থেকে। ব্যতিক্রম শুধু প্রতিরক্ষার জন্য তৈরী কিছু যন্ত্রপাতি। যন্ত্রাংশ জোড়ার কাজটি স্ক্রু-ড্রাইভার প্রযুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়, এবং এই শিল্প বেঁচে আছে পরিকল্পিত সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্পের উপর নির্ভর করে। এই প্রকল্পের কাজ যখন শেষ হবে তখন এ থেকে যে সব সমন্বিত বর্তনী (Integrated Circuit) তৈরী হবে তার দাম পড়বে আন্তর্জাতিক বাজার-দরের তুলনায় পাঁচ-দশগুণ বেশী। এদিকে C S I R-এর অবস্থা আরো একটু বেশী জটিল। যেমন জটিল এই সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো—আটত্রিশটি ল্যাবরেটরী একশরও বেশী এক্সটেনশন এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক কেন্দ্র, পনের হাজার মত বিজ্ঞানী ও সহযোগী কর্মী, আর বছরে একশ তিন কোটি টাকার বাজেট নিয়ে এই কাঠামো। এই সংস্থার অধীন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম নিঃসন্দেহে ভাল, যেমন সেন্ট্রাল মেকানিকাল এঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিট্যুট, সেন্ট্রাল ফুড টেকনোলজি রিসার্চ ইনস্টিটুট্যুট, এবং বিশেষেত, ন্যাশনাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী। সাড়ে চব্বিশ অশ্বশক্তির স্বরাজ 724 ট্র্যাক্টর, আমুল মিল্ক বেবী ফুড, ওষুধ ও রাসায়নিক সংক্রান্ত অনেকগুলি প্রক্রিয়া, এবং এছাড়া কিছু প্রথাগত খাদ্য ও খাদ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন—এগুলি এদেশের 'আর অ্যান্ড ডি' প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য ফল রূপে পরিগণিত হবে।

কিন্তু তবু CSIR-এর বাজেট ও জনশক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই খরচ হয়ে যায় এমন সব প্রকল্পের পিছনে যেগুলো কি শিল্পের ক্ষেত্রে, কি ব্যবহারিক জগতে, কোনো উলেখযোগ্য ফলাফলই দেখাতে পারছে না।

অনেকগুলি প্রকল্প থেকে এমনকি পাইলট প্ল্যান্ট বা প্রাথমিক ধরনের কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ পর্যন্তও পাওয়া সম্ভব নয়। এইসব প্রকল্পের বেশীর ভাগের বেলায়ই ব্যবহারকারী শিল্পের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ না থাকাটাই মূল সমস্যা নয়। মূল সমস্যা এও নয় যে, প্রকল্পের সংখ্যা প্রচুর (একমাত্র সি.এস.আই আর-এই 1800 মত !) অথচ তাদের ভিতর সমন্বয় সাধনের কোনো চেষ্টা নেই।

একথা ঠিক যে একই ক্ষেত্রে অত্যন্ত বেশী সংখ্যক পরস্পর যোগসূত্রহীন প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে এবং প্রকল্পগুলি ছড়িয়ে রয়েছে বড় বেশী সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে। এটাও জানা কথা যে এগুলির ভিতর অন্তত অর্ধেক সংখ্যক প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ প্রয়োজনীয় মাত্রার কম, যার ফলে এগুলি পরিণত হয় "আমিও আছি" গোছের কিছু প্রকল্পে, এবং এগুলি থেকে নতুন কোনো ফল পাওয়া যায় না।

আসল সমস্যার মূল কিন্তু নিহিত রয়েছে নীতিনির্ধারণের একপেশেমি-গুলিতে, বাস্তবমুখী লক্ষ্য এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের আর নেতৃত্বের অভাবে, নিম্নমানের ব্যবস্থাপনায়। শিল্পোন্নত, প্রধানত পশ্চিমী, দেশগুলি যে সমস্ত ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রে বাতিকগ্রস্তের মত সমকক্ষ হতে চাওয়াটাই ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচীর মূল অভিমুখে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, পাশ্চাত্যে যে বিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সার্থক অথবা সন্তোষজনক বলে গৃহীত হয়েছে সেগুলিই এখানে সর্বোত্তম এবং উপযুক্ত বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কর্মসূচী যে গন্ডীর ভিতর কাজ করছে এবং আলাদা করে প্রতিটি প্রকল্পকে যে ধাপগুলির ভিতর দিয়ে এগুতে হচ্ছে, সে সবই সরাসরি নির্ধারিত হচ্ছে এই মূল ব্যাপারটি দ্বারাই। এই ছকের ভিতর আধুনিক পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের পার্থক্যের একমাত্র স্বীকৃতি থাকছে লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণগত সংকোচনে—900 মেগাওয়াটের বদলে 235 MW নিউক্লীয় চুল্লী, অথবা বছরে ছয়টির জায়গায় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ।

ভারতের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও সমাজ বিকাশের জন্য বাস্তবমুখী পরিকল্পনার যে দৃষ্টিভঙ্গী থাকা দরকার উপরে উল্লিখিত নকলনবিশীর দৃষ্টি-ভঙ্গী তার সম্পূর্ণ উল্টো। সুতরাং বর্তমান ভারতবর্ষকে প্রতিনিয়ত জর্জরিত করে রেখেছে যে সমস্ত সমস্যা, যেমন ব্যাপকহারে বনভূমির উচ্ছেদ, গোটা পরিবেশের সংকটজনক অবনতি, প্রাকৃতিক জলভান্ডার ধ্বংস, জমিতে জল জমা ও নোনা ধরে যাওয়া, কিছুদিন অন্তর বন্যা ও খরার নিয়মিত প্রকোপ, বাঁধে পলি পড়ে অকেজো হয়ে যাওয়া, এবং ব্যাপক শক্তি সংকট (যা সব সময় শহর ও গ্রামের দরিদ্র মানুষকে আতঙ্কিত করে রেখেছে), এতদিন ধরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্মসূচী যে এইসব সমস্যাকে পুরোপুরি অবহেলা করে এসেছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

সুচিন্তিত পদক্ষেপ

এইসব সমস্যাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ধরা ও তাদের সমাধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার পূর্বসর্ত হল পশ্চিমকে অনুকরণের বাতিক ত্যাগ করা। তবে দেশের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে বিশেষ সম্ভাবনাময় কিছু 'অগ্রণী' প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার দরকার নেই একথা অবশ্য বলছি না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বর্তমান অভিমুখ নতুন করে ঢেলে সাজানোর ও সেই অনুযায়ী আর্থিক অনুদানের বর্তমান কাঠামোটিকে (যা আমাদের দেশে পশ্চিমের অনুকরণাশ্রয়ী হয়ে রয়েছে) আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে চালিত করার কথাই বলা হচ্ছে এখানে। তাই উন্নতমানের কারিগরী ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুচিন্তিত নির্বাচন পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে। যেমন ধরা যাক—মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্সের কথা। বছরে দশ কোটি টাকা খরচ করে ভারতের পক্ষে এই কারিগরীর শীর্ষস্থানে পৌঁছনো সম্ভব নয়। তার জন্য অন্তত দশ থেকে কুড়ি গুণ টাকার দরকার। আর তা করতে চাইলে আমাদের দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনেক কর্মসূচী বাদ দিতে হয়।

এখানে যে উপাদানটিকে সরকারী নীতির অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হচ্ছে, অনেক সময় সেটিকে অবজ্ঞা করে বলা হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে হাতুড়ে দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টীভঙ্গী গ্রহণ করলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রচেষ্টার বিকেন্দ্রীভবন ঘটবে, নির্দিষ্ট স্থানীয় এবং মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান নির্ণয়ের চেষ্টা উৎসাহ পাবে, এবং অতীতে-বিজ্ঞানী-বর্তমানে-আমলা জাতীয় লোকেদের দ্বারা পরিচালিত বিরাট বিজ্ঞান-সাম্রাজ্যের পতন ঘটবে।

[17 অক্টোবর 1983 তারিখের টাইম্‌স অভ ইন্ডিয়া কাগজ থেকে গৃহীত]

অনুবাদ ঃ পার্থসারথি দেবনাথ

দৃষ্টিকোণ

বিজ্ঞানমনস্কতা কি

["যোজনা", 15 ই আগস্ট 1983 সংখ্যায় প্রকাশিত What is Scientific temper শীর্ষক বিবৃতির অনুবাদ]

বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির চেয়ে বিজ্ঞানমনস্কতার সামাজিক ব্যাপ্তি অনেক বেশী। বিজ্ঞানমনস্কতা কিছু তথ্য বা জ্ঞানের সমষ্টিমাত্র নয়, যদিও তা জ্ঞানকে প্রসারিত করে ; এটা শুধু যুক্তিনির্ভরতাও নয়, যদিও তা যুক্তিবাদী ভাবনাচিন্তার সহায়ক। বিজ্ঞানমনস্কতা এসবের চেয়েও বেশী কিছু। এ হ'ল একটি বিশেষ মনোভঙ্গী (attitude) যা একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচারব্যবহারের ধরণ দাবী করে। এর উপযোগিতা বিশ্বজনীন এবং একটি মুখ্য মূল্যবোধ হিসেবে সমাজকে এর দ্বারা সিঞ্চিত করা প্রয়োজন, যাতে আমরা রাজনৈতিক, সামাজিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যা অনুধাবন ও সমাধানের ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রভাব বুঝতে পারি।

প্রাসঙ্গিক অনেক কিছুর মধ্যে, নিম্নোক্ত মৌল ধারণাগুলি গ্রহণ করার মধ্যে বিজ্ঞানমস্কতা নিহিত ঃ

ক) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি জ্ঞানার্জনের একটি উপযুক্ত পদ্ধতি

খ) মানবিক সমস্যাগুলি অনুধাবন ও সমাধানের ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান সহায়ক ভূমিকা পালন করে

গ) মানবজাতির অস্তিত্ব ও প্রগতি সুনিশ্চিত করতে এবং নৈতিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক—দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাপকতম ব্যবহার একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

ঘ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে অর্জিত জ্ঞান সেই সময়ের জন্য, সত্যের নিকটতম হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত এই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি তা প্রশ্ন করা এবং মাঝে মাঝে তাৎক্ষণিক জ্ঞানের ভিত্তির পুণর্মূল্যায়ন করা।

সুতরাং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে বোঝায় তথ্য সংগ্রহের এবং সংগৃহীত তথ্যকে পৌনঃপুনিক ব্যবহারের এমন এক পদ্ধতি যার প্রয়োগে একটি অর্থবহ প্যাটার্ন গড়ে তোলা যায় এবং মানুষের নিজস্ব স্বভাব এবং তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কেও সুগ্রথিত বোধ গড়ে ওঠে। এই অর্থে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হস্তান্তরযোগ্য যাবতীয় মানবিক জ্ঞানের বিষয়কে অঙ্গীভূত করে এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান ফলিত বিজ্ঞান ইত্যাদি কৃত্রিম বিভাজনের বিরোধিতা করে।

অনুসন্ধিৎসা এবং জিজ্ঞাসা করার ও জিজ্ঞাসিত হবার অধিকারের স্বীকৃতি বিজ্ঞানমনস্কতার মূল কথা। কোন বস্তু ঘটনা বা প্রতীতির 'কি', 'কেন', 'কেমন করে' জিজ্ঞাসা করার দাবী জানায় বিজ্ঞানমনস্কতা ; ব্যক্তিকে তা উদ্বুদ্ধ করে প্রশ্ন করার অধিকার প্রয়োগ করতে। অবশ্য, প্রচলিত কোন তত্ত্ব, প্রকল্প বা সংজ্ঞার বা কোন সামাজিক অবস্থার বিষয়ে প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে হওয়া উচিত, তা যেন ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসকে প্রাধান্য দেওয়ায় পর্যবসিত না

হয়। বিজ্ঞানমনস্কতা, অতএব, সমস্ত ধরনের কর্তৃত্ব বা গুরুগিরি নির্বিচারে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়; কোন কিছুই, কেউই, সেখানে প্রশ্নাতীত নয়। বিজ্ঞানমনস্কতা এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটায় যে ঘটনাসমূহ বোধগম্য ও বর্ণনীয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক শক্তিসমষ্টির ঘাত-প্রতিঘাতের ফসল; কখনই সেগুলি বিশেষ কারও ইচ্ছার প্রকাশ নয়, তা তিনি যত বড়ই হোন না কেন! এইসব শক্তি প্রায়শই জটিল এবং পরস্পর সম্পৃক্ত এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেগুলিকে পৃথকভাবে বোঝা দরকার।

বিজ্ঞানমনস্কতা—পর্যবেক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টি, কার্যকারণ সম্পর্কানুসন্ধান ও সত্যানুভূতি, প্রণালীবদ্ধ কাজ ও শৈল্পিক আবেগ—এসবের সঙ্গেই সঙ্গতি-পূর্ণ। এর অধিকারী এমন এক মানসিক গঠন প্রাপ্ত হয় যার দ্বারা অজ্ঞানতার সুবিশাল ক্ষেত্র সম্পর্কে সচেতন থেকেও চারপাশের সমস্ত রহস্যজাল ছিন্ন করার মানবিক ক্ষমতায় সে থাকতে পারে আশাবাদী। বিজ্ঞানমনস্কতা তাই সংস্কৃতিরও অঙ্গবিশেষ। এ একটি দর্শন, জীবনযাপনের একটি পথনির্দেশ, যার দ্বারা খোলামনে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যায়।

জ্ঞানের বিকাশের পথে প্রায়শই পুরনো ধারণা, বিশ্বাস, তত্ত্ব ও সূত্র নস্যাৎ হয়ে যেতে পারে—এই ধারণার স্বীকৃতি সূচিত করে বিজ্ঞানমনস্কতা। বিজ্ঞান-মনস্কতা জ্ঞানকে অসীম ও চিরবিবর্তনশীল গণ্য করে। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রেই তা প্রমাণযোগ্যতা ও পুনঃ পুনঃ সম্পাদনযোগ্যতার উপর জোর দেয় এবং জোর দেয় এই সত্যের উপর যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সূত্র এবং তথ্য ব্যক্তিকে অনেক দূর সামনে দেখতে সাহায্য করে। কোন বিশেষ সময়ে উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের উত্তর ঐ সময়ে নাও পাওয়া যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতা 'আমি জানি না' বলার সাহস ও সৌজন্য দাবী করে।

বিজ্ঞানমনস্কতা একথা অনুধাবন করার দাবী জানায় যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব এবং ধর্মতাত্ত্বিক ও অধিবিদ্যক মনোভাবের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান; ধর্মীয় গোঁড়ামির ক্ষেত্রে যা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বস্তুত সমস্ত ধরনের গোঁড়ামির সঙ্গেই বিজ্ঞানের মৌলিক পার্থক্য আছে। বিজ্ঞান যেখানে বিশ্বজনীন, সমস্ত প্রচলিত ধর্ম ও ধর্মীয় গোঁড়ামি সেখানে বিভাজক। খ্রীষ্ট, মুসলিম, বৌদ্ধ এবং হিন্দুধর্মের অন্তর্বিভাজনের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজ্ঞান, এর বিপরীতে, সমস্ত বিভাজন পেরিয়ে বিশ্বজননীতায় উত্তরণ ঘটায়।

বিজ্ঞানমনস্কতার অন্তর্ভুক্ত গভীর ভাবাবেগ ও একটি সৌন্দর্যবোধও এর অন্তর্গত। সেজন্যই, অনেক ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য ও সারল্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিকল্প তত্ত্বের মধ্য থেকে সঠিকতর তত্ত্বটি বেছে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। মূল্যবোধের একটি রূপরেখাও বিজ্ঞানমনস্কতার অঙ্গীভূত। আমাদের সমাজে বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ ঘটলে জনসাধারণ বাস্তবমুখী ও নিরপেক্ষ হয়ে উঠবে; সমদর্শিতা, গণতান্ত্রিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিশ্বজনীনতার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার একটি পরিমণ্ডল তৈরী হবে। আমাদের মত একটি ব্যাপক অসাম্যের সমাজে—যেখানে শতকরা 50 জন মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে এবং শতকরা 70 জন, বিশেষত নারীরা নিরক্ষর, সেখানে বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশ লাভ করতে পারে না। বিজ্ঞানমনস্কতা বিকাশের জন্য এবং বিজ্ঞান ও কারিগরির ফসল-গুলির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বসর্ত হ'ল সামাজিক ন্যায়, ব্যাপক শিক্ষা এবং অবাধ পারস্পরিক আদানপ্রদান।

['দৃষ্টিকোণ' কলামের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে পাঠকের কাছ থেকে মতামত-সম্বলিত লেখা চাইছি। মতামত যাই হোক, বাধা নেই। এই কলামে প্রকাশিত কোনো মতামতের উপর যদি কেউ আলোচনা-সমালোচনা পাঠাতে চান, তাও পাঠাতে পারেন। বর্তমান সংখ্যায় যে বিবৃতিটি প্রকাশিত হ'ল তা নিয়ে দেশের বিভিন্ন মহলে প্রচুর আলোচনা চলছে। এই বিষয়টির উপর পাঠকের মতামত আহ্বান করছি।

—সঃ মঃ/'বি-ও-বি']

ELECDROLIK ENGINEERING COMPANY

Sri Aurobindo Road, Ramrajatala

Howrah-711104.

Phone : 67-2017

Gram : SPOOLVAL, Satragachi

MANUFACTURERS OF :

PORTABLE OIL HYDRAULIC EQUIPMENT, viz :

Hydraulic Floor Crane capacity 1-2 tonnes, Hand/Power operated Hydraulic Compressor jointing of ACSR conductor capacity 100 tonnes. Power operated 2 stage High Pressure Pump Unit upto 600 Kg/cm². Hand operated Pump Unit upto 800 Kg/cm². Lever operated spool type Directional Control Valve with in-built pilot operated Check valve. Hand/Power operated Hydraulic Clamp/Vice capaciiy upto 10 tonnes.

বিজ্ঞান বনাম ব্যক্তিমানস—রামানুজন-সত্যেন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্র

অভিজিৎ লাহিড়ী

অগ্রসর বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং পশ্চাৎপদ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার ভিতর দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয় প্রধানত বিজ্ঞানীর মানসলোকের নানান সংঘাতের ভিতর দিয়ে।

উনিশ শ' চোদ্দ'র এপ্রিলে এক 'নিঃসঙ্গ হিন্দুকেরাণী' অনেকগুলি অঙ্কের ফর্মুলায় ভরা একটি নোটবই সঙ্গে নিয়ে অনভ্যস্ত সাহেবী পোশাক পরে ঢুকেছিল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। কিছুদিন আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল অঙ্কের অধ্যাপক জি. এইচ. হার্ডি'র— হার্ডি'রই পৃষ্ঠপোষকতা সম্বল করে চ'লে এসেছিল ইংল্যান্ডে। অক্সফোর্ড-কেমব্রিজের একাডেমিক আবহাওয়ায় বছর পাঁচেক ছিল এই অদ্ভুত ধরনের আত্মমগ্ন, বেখাপ্পা, তামিল ব্রাহ্মণ যুবক। সাহেবী পারিপার্শ্বিক থেকে নিজেকে সাংঘাতিকরকম গুটিয়ে রাখতো সবসময়। তাই পরিচিত হয় নি বেশী লোকের কাছে। কিন্তু ছোট পরিসরের যে একাডেমিক মহল জেনেছিল তাকে, সেই মহলের কাছে একটা বিচিত্র বিস্ময়ের চিহ্ন হ'য়ে উঠেছিল শ্রীনিবাস রামানুজন।

প্রায় তান্ত্রিক ধরনের রহস্যবাদ আর ধর্মীয় কুহেলিকায় ভরা তার মস্তিষ্কটি থেকে কিভাবে যে বেরুত বিশুদ্ধ গণিতের অসাধারণ উপপাদ্যগুলি, তার কোনো হদিশই পায়নি পাশ্চাত্ত্য গণিতজ্ঞরা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এইসব উপপাদ্যের কোনো সন্তোষজনক 'প্রমাণ' দিতে পারতো না রামানুজন নিজেই। বস্তুত অনেক পরিশ্রম করেও হার্ডি যুক্তিমূলক, সিদ্ধান্ত-আশ্রয়ী, প্রমাণ ব্যাপারটাকেই রামানুজনের চিন্তাধারার অংগীভূত করতে পারেন নি। বাইরের প্রশিক্ষণের কোনো প্রভাবই ছিল না তার উপর। যেন তার মনের কোনো এক আদিম গভীরতা থেকে বেরিয়ে আসত উপপাদ্যগুলি, যে গভীরতায় গণিত, তন্ত্রভাবনা, রহস্যবাদ, ব্যক্তিগত মানসলোকের নানান কুহেলিকা, পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে থাকত। রামানুজন কখনো ঠিকমতো চেষ্টাই করেনি এই জট ছাড়িয়ে বাইরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার গণিতচিন্তাকে একটা পরিশীলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ দিতে।

এখানেই ছিল রামানুজনের জোর, এখানেই ছিল দুর্বলতা। এই দুর্বলতাই একটা গভীর ব্যর্থতার রূপ নিয়ে রামানুজনের নিজের কাছে ধরা পড়েছিল সম্ভবত ইংলন্ডে যাওয়ার বছর তিনেকের মাথায়। রামানুজন বুঝলেন যে গণিতে তাঁর আবিষ্কার গুলির বেশীর ভাগই অনেকদিন আগে আবিষ্কার করে গেছেন অয়লার, গাউস, আর পাশ্চাত্ত্য গণিতের অন্যান্য মহারথীরা। শুধুমাত্র একটা কলেজের অঙ্কের বই থেকে শুরু করে এই সব উপপাদ্য পুনরাবিষ্কার করার আসাধারণত্বের দিকটা তাঁর নিজের কাছে তেমন অর্থবহ ছিল না স্বভাবতই। গাণিতিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে সম্ভবত যোগ হয়েছিল একান্ত ব্যক্তিগত অস্তিত্বের স্তরে আরো অন্যান্য সংকট। উনিশ শ' সতেরোয় আত্মহত্যার এক ব্যর্থ অ্যাটেম্পট নিলেন রামানুজন। সেই বছরেরই মে মাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন যক্ষ্মা রোগে। যে নিঃসঙ্গ কেরাণীটি পাঁচ বছর আগে গ্রাম ছেড়ে এসেছিল ইংল্যান্ডে তার চেয়েও নিঃসঙ্গ, রোগগ্রস্ত, গণিতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা রামানুজন অদ্ভুত এক অচরিতার্থতাবোধ নিয়ে দেশে ফিরলেন উনিশ শ' উনিশে। দেশে ফিরেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করলেন রোগশয্যায়ই।

স্বল্প পরিসরের জীবনে বিরল প্রতিশ্রুতি, আর তার বিপরীতে এক বিষাদঘন ট্রাজেডির ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান-সমাজ-সংস্কৃতি-মানুষ বিষয়ে এমন কতগুলি গভীর প্রশ্ন রেখে গেলেন শ্রীনিবাস রামানুজন, যেগুলি ঠিকমত অনুধাবন করা তাঁর নিজের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। শুধু তাঁর নিজের পক্ষে কেন, সে সময়ে কারুর কাছেই তেমন তাৎপর্য নিয়ে ধরা পড়েনি প্রশ্নগুলি। কারণ বিজ্ঞান সম্পর্কে যে ইমেজ তখন চালু ছিল সমাজে, মানুষের মনে—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আর বিজ্ঞানচিন্তার বিরাট সাফল্য থেকে যে ইমেজটা বেরিয়ে এসেছিল—তার উপর বড়রকম সংশয়ের ছায়া পড়েনি তখনো। আজকে, উনিশ শ' সত্তর-আশির দশকে এসে এই ইমেজটা কিন্তু নাড়া খেয়ে টুকরো টুকরো হতে বসেছে। কেলিডোস্কোপের নক্সার মত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের ধারণা। রামানুজনের সাফল্য-ব্যর্থতার প্রিজমের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানের যে চেহারাটা ধরা পড়ে সেটা আজ প্রাসঙ্গিক।

* * * * *

তামিল গাণিতিক রামানুজনের সঙ্গে কোথায় যেন অদ্ভুতরকম মিল বাঙালী পদার্থবিদ্ সত্যেন্দ্রনাথের। একটু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, রামানুজনের অসাধারণ অথচ অচরিতার্থ প্রতিভার উপর প্রায় কোনোই ছাপ পড়ে নি তাঁর পাশ্চাত্য প্রবাসের। যে অভ্যন্তরীণ সৃজনশীলতার প্রকাশের আশায় রামানুজন গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে, অনেকটা সেই একই আশা নিয়ে উনিশ শ' চব্বিশের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বছর দুয়েকের জন্য বসু গিয়েছিলেন প্যারিসে, প্যারিস থেকে বার্লিন ও ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি জায়গায়। অথচ সৃজনশীলতার স্ফুরণ ত দূরের কথা, উল্টে এক ধরনের অবদমনের শিকার হয়ে দেশে ফিরলেন বসু।

যেন তার মনের কোনো এক আদিম গভীরতা থেকে বেরিয়ে আসত উপপাদ্যগুলি, যে গভীরতায় গণিত, তন্ত্রভাবনা, রহস্যবাদ, ব্যক্তিগত মানসলোকের নানান কুহেলিকা, পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে থাকত।

যে অভ্যন্তরীণ সৃজনশীলতার প্রকাশের আশায় রামানুজন গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে, অনেকটা সেই একই আশা নিয়ে উনিশ শ' চব্বিশের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বছর দুয়েকের জন্য বসু গিয়েছিলেন

প্যারিসে, প্যারিস থেকে বার্লিন ও ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি জায়গায়। অথচ সৃজনশীলতার স্ফুরণ ত দূরের কথা, উল্টে এক ধরনের অবদমনের শিকার হয়ে দেশে ফিরলেন বসু।

রামানুজনের মতই এই বিদেশ যাত্রায় বসুর জীবনে প্রতিশ্রুতি, সম্ভাবনা আর আশার এক আবর্ত সৃষ্টি হয়ে মিলিয়ে গেল এক অদ্ভুত ধরনের অচরিতার্থতার ভিতর। অথচ দুজনেরই প্রতিভা প্রশ্নাতীত। এই বৈপরীত্যের সূত্র ধরে আন্দাজ পাওয়া যায় বিজ্ঞানের অন্তর্গত দিকটির। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতায় ব্যক্তিমানসের ভিতরকার, গভীরের স্তরের, গঠন, তার টানাপোড়েন, নানান অবচেতন কল্পভাবনা, এইসবের নির্ধারক ভূমিকার। বিজ্ঞানকে আবেগ-অনুভূতি-কল্পভাবনা বিবর্জিত, বস্তুগত, ব্যক্তিনিরপেক্ষ তথ্য ও তত্ত্বের সমাহার রূপে দেখার যে দৃষ্টিকোণ, যা থেকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত 'সাইবারনেটিক' সমাজকে আদর্শ বলে ভাবার মানসিকতা রূপ পাচ্ছে, তার বিপরীতে বিজ্ঞানের আন্তর্গত দিকটি আজ ক্রমশ বেশী করে তাৎপর্য পাচ্ছে অন্তত কিছু মানুষের কাছে। রামানুজন বা সত্যেন বসুর গবেষণাজীবন এই আন্তর্গত দিকটিরই ইঙ্গিত দেয়।

আপাতদৃষ্টিতে অবশ্য রামানুজন আর বসুর মানসিকতা, সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, ব্যক্তিগত মানসিক বিকাশের ইতিহাস, সবই অনেকটা আলাদা। রামানুজনের তুলনায় বসু মানসিক গঠনে, রুচিতে, সংস্কৃতিতে, অনেক 'আধুনিক', অনেক পরিশীলিত। বহু বিস্তৃত পরিসর জুড়ে, অনেকরকম বিষয়ে ছিল তাঁর জ্ঞান, তাঁর আগ্রহ। রামানুজন সেখানে সনাতনী হিন্দু ভাবধারার গোঁড়া প্রতিনিধি, আধুনিক অর্থে সংস্কৃতি কথাটাই যাঁর কাছে অর্থহীন। কিন্তু দুজনের ভিতর মিল হ'ল, দুজনেই ছিলেন সাংঘাতিক রকম আত্মমগ্ন।

নিজেদের মানসলোককে কেউই উন্মুক্ত করতে রাজি ছিলেন না বাইরের জগতের নানান উপাদানের টানাপোড়েনের কাছে। রামানুজনের ক্ষেত্রে, তাঁর জীবনদর্শনের প্রেক্ষাপটে, এই উন্মুক্ত করার ব্যাপারটা ত' সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকই ছিল। বসু বরং তার তুলনায় অনেকটা কাছাকাছি এসেছিলেন এই ধরনের প্রয়াসের। বাইরের উপাদান বলতে যদি প্রধানত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচিন্তার প্রথাপ্রকরণ বোঝানো হয়, তবে রামানুজনের বিপরীতে বসুর পুরো বিজ্ঞানগবেষণাই ছিল এই উপাদানে অনুপ্রাণিত। কিন্তু অনুপ্রেণাই সব নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তার দীর্ঘ বিকাশের পথ ধরে গড়ে তুলেছে একটা গোটা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল, একটা বিশেষ মানসিক 'অ্যাপ্রোচ'। এবং বিজ্ঞানের এই সংস্কৃতি এমনভাবে পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে যে সমাজমানসে দুইয়ের ভিতর বড়রকম টানাপোড়েন দেখা দেয় না, বা অন্তত এতদিন পর্যন্ত দেয় নি। বসুর ব্যক্তিমানস কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই মানসিক অ্যাপ্রোচের সঙ্গে একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। সঙ্গতিপূর্ণ থাকার কথাও নয়, কারণ তিনি সম্পূর্ণ অন্য সাংস্কৃতিক সামাজিক পরিমন্ডলের লোক। কিন্তু তাঁরই সতীর্থ মেঘনাদ সাহা যেখানে নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাকে অনেক বেশী মাত্রায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মানসিক-সাংস্কৃতিক অ্যাপ্রোচের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে প্রস্তুত ছিলেন, বসু তা ছিলেন না।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর মানসিক গঠন, তাঁর সংবেদনশীলতা, আত্মমগ্নতা, নানান ধরনের 'ইনহিবিশন', এইসব মিলে তখনকার দিনে ইউরোপে উচ্চতম স্তরে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক অ্যাপ্রোচ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করল।

খাপ খাইয়ে নেব না, এরকম কোনো সচেতন জিদ অবশ্য বসুর ছিল না। থাকলে তিনি কখনো ঢাকা ছেড়ে ইউরোপ পাড়ি দিতেন না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর মানসিক গঠন, তাঁর সংবেদনশীলতা, আত্মমগ্নতা, নানান ধরনের 'ইনহিবিশন', এইসব মিলে তখনকার দিনে ইউরোপে উচ্চতম স্তরে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক অ্যাপ্রোচ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করল। বিশেষত একজন বিদেশী তরুণ গবেষকের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান গবেষণার অন্তর্লীন প্রথাপ্রকরণের সঙ্গে ব্যক্তিগত মানসিক গঠনকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বসু কিন্তু সে চেষ্টার দিকে গেলেন না। এরই প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখা যায়, মাদাম কুরীর ল্যাবরেটরীতে কাজ করার ইচ্ছা নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও বসু তাঁকে মুখ ফুটে বললেন না যে, ল্যাবরেটরীতে কাজ চালানোর মত ফরাসী ভাষা তাঁর (বসুর) ভালই জানা আছে। না বলে মাদাম কুরীর উপদেশ নীরবে শুনে চলে এলেন তাঁর সম্মুখ থেকে। পরে আর ফিরে গিয়ে আবেদনই করলেন না।

তার পর ধরা যাক বসুর দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটির কথা, এবং এই প্রসঙ্গে আইনস্টাইন সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের কথা।

উনিশ শ' সালে মাক্স প্লাঙ্ক তাঁর নামাঙ্কিত যে বিকীরণ সূত্রটি উপস্থাপিত করেন সেটির কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না অনেকদিন ধরে। আইনস্টাইন প্রথম থেকেই ভাবছিলেন এ নিয়ে। উনিশ শ' চব্বিশে বসুর প্রথম ও সাড়া-জাগানো গবেষণাপত্রটি দেখে আইনস্টাইন তাই চট করে উপলব্ধি করলেন এর অসাধারণ তাৎপর্য। কাজটির প্রশংসা করে আইনস্টাইন অতি দ্রুত এর সাহায্যে দু'-তিনটি মৌলিক নিবন্ধ প্রকল্প করলেন, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল বসুর অনুসৃত পদ্ধতিকে বিকীরণের বদলে এক-পারমাণবিকের গ্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। আইনস্টাইন যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তা আর এক তরুণ গবেষক লুই দ্য ব্রয়লীর একটি চমকপ্রদ অনুমানের সমর্থন যোগালো—পদার্থ-কণিকারও তরঙ্গসত্ত্বা আছে, এই ধারণা কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হল। এবং শেষ পর্যন্ত শ্রোয়েডিঙ্গারের হাতে রচিত হল কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার তত্ত্বগত বনিয়াদ। এইভাবে বসুর কাজ শুধু কোয়ান্টাম সংখ্যায়নেরই নয়, গোটা কোয়ান্টাম তত্ত্বের গঠনে এক প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ 'লিঙ্ক'-এর কাজ করেছিল। যদিও অবশ্য বসু নিজে তাঁর কাজের এই তাৎপর্য সম্পর্কে তেমন সচেতন ছিলেন না। থাকা সম্ভবও ছিল না, কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে সমসাময়িক নানান চিন্তাভাবনার সঙ্গে তিনি পরিচিত হবেনই বা কি করে? তবে ইউরোপে এসে যখন এইসব চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাঁর পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হল তখন কিন্তু নিজেকে গুটিয়ে রাখলেন বসু।

এমন কি তাঁর দ্বিতীয় গবেষণাপত্রটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেও আইনস্টাইন যখন সে সম্পর্কে নিরুৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্য করলেন, তখনও নীরব রইলেন সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের কাছে কাজটির মূল্য ছিল কিন্তু খুব বেশী, এবং জীবনের শেষ দিকেও এটি সম্পর্কে তাঁর উচ্চ ধারণা অটুট ছিল। কিন্তু

প্ররোচিত বিকীরণ ('স্টিমুলেটেড এমিশন') সম্পর্কে আইনস্টাইনের বক্তব্যের সঙ্গে আপাতবিরোধ থাকায় বসুর এই কাজ স্বীকৃতি পেল না তেমন। তার পর ডিরাক যখন দেখালেন যে বিকীরণের কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে স্বতস্ফূর্ত ও প্ররোচিত বিকীরণ সম্পর্কিত আইনস্টাইনের সিদ্ধান্তগুলি সমর্থিত হয় তখন বসুর কাজটি চলে গেল বিস্মৃতির অন্ধকারে। বসুও কিন্তু কোনো চেষ্টা করলেন না তাঁর কাজের মৌলিক দিকগুলি বিশদে ব্যাখ্যা করে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করতে অথবা নতুন বিকীরণ তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর অনুমানের আপাতবিরোধ ঘোচাতে। মনে মনে আইনস্টাইনের সঙ্গে একমত না হয়েও তাঁর সঙ্গে কোনো বিতর্কে গেলেন না বসু। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে 'মাষ্টারমশাই' বলে উল্লেখ করতেন। আইনস্টাইনের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখনো কথাবার্তা হল মামুলী কিছু বিষয় নিয়ে। ইউরোপের নাম করা অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও বিশদে আলোচনা করার কোনো উদ্যম দেখালেন না সত্যেন্দ্রনাথ। কি ছিল তাঁর মনের ভিতর? আহত অভিমান? লাজুকতা? বিশেষ ধরনের কোনো সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স? আত্মমর্যাদাবোধসঞ্জাত কোনো ইনহিবিশন? না কি সবগুলির কোনো মিশ্রণ? যাই থেকে থাকুক, নীট ফল দাঁড়াল এই—নিজের মেজাজ, নিজের মানসিকতার প্রতিই বেশী বিশ্বস্ত থাকলেন বসু, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান গবেষণার আবর্তে জড়াতে গিয়েও জড়ালেন না নিজেকে। রামানুজনের তুলনায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের প্রথাপ্রকরণের অনেক কাছাকাছি গিয়েও শেষ পর্যন্ত রামানুজনের মতই নিঃসঙ্গ রইলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

* * * * * *

নিজের মানসিকতা, নিজের অন্তর্জগৎকে আঁকড়ে থাকায় তাঁদের প্রতিভার অনুপাতিক গুণ ও পরিমাণ মত সৃজনশীল কাজ রেখে যেতে পারেন নি রামানুজন বা বসু। কিন্তু তার সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও উল্লেখ করার মত—বাইরের উপাদানের অধীনতা থেকে মুক্ত থাকায় বড় রকম কোনো অতিরিক্ত সংঘাত, টানাপোড়েন বা বিকৃতির শিকার হতে হয় নি তাঁদের মানসিক গঠনকে। ঠিক এর উল্টো ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় 'আধুনিক' ভারতীয় বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃত জগদীশ বসুর ক্ষেত্রে।

জগদীশচন্দ্র ছিলেন অসাধারণ মৌলিক প্রতিভাসম্পন্ন যন্ত্রবিদ্। গাণিতিক ও তত্ত্বগত পারদর্শিতা তেমন না থাকলেও পদার্থবিদ্যা ও প্রকৃতিবিদ্যার কয়েকটি বিষয়ে তাঁর ছিল বেশ গভীর অন্তর্দৃষ্টি। ছোটবেলা থেকেই নানা রকম যন্ত্রপাতি কলকব্জা তৈরীতে আর প্রকৃতিপর্যবেক্ষণে তাঁর ছিল প্রচণ্ড আগ্রহ। তবে জগদীশচন্দ্র কিন্তু তাঁর এই যন্ত্রপ্রতিভা এবং অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা আবিষ্কারে উৎসাহী ছিলেন না। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাঁর ক্ষেত্রে প্রধানত ভিতরকার তাগিদের ব্যাপার ছিল না। ভিতরকার তাগিদ নিশ্চই ছিল, কিন্তু জগদীশচন্দ্র তাকে অন্য এক তাৎপর্য দিতে চাইলেন। এবং এখানেই তিনি নিজেকে উন্মুক্ত করেছিলেন এমন এক প্রস্থ উপাদানের টানাপোড়েনের কাছে যা জীর্ণ, বিপর্যস্ত করতে থাকল তাঁর মানসিক গঠনের সংহতি এবং শেষ পর্যন্ত সংক্রামিত করল তাঁর বৈজ্ঞানিক সৃজনশীলতাকে।

জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রধানত একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন—ঔপনিবেশিক অবদমনের বিপরীতে 'আধুনিক' ভারতীয় বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ভিতরকার গ্লানিবোধ কাটিয়ে জাতীয় আত্মমর্যাদা খোঁজার মাধ্যম।

জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রধানত একটি মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলেন—ঔপনিবেশিক অবদমনের বিপরীতে 'আধুনিক' ভারতীয় বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ভিতরকার গ্লানিবোধ কাটিয়ে জাতীয় আত্মমর্যাদা খোঁজার মাধ্যম।

এ ব্যাপারে অবশ্য জগদীশচন্দ্র তখনকার একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবণতার প্রতিনিধিই ছিলেন। এবং ছিলেন বলেই জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-গবেষণা তাঁর পরীক্ষাগার ছাড়িয়ে অনেক ব্যাপক পরিসরের মানুষের কাছে এক বিশেষ প্রতীকী তাৎপর্য পেয়ে গিয়েছিল। এটাও আবার পরে আর এক ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল জগদীশচন্দ্রের ওপর, তবে সেটা অন্য ব্যাপার।

মূল গণ্ডগোলটা ছিল অন্য জায়গায়। জগদীশচন্দ্র ঔপনিবেশিক বশ্যতার বিপরীতে জাতীয় আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে ক্ষেত্রটা বেছে নিলেন সেটা হ'ল বিজ্ঞান গবেষণা। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সামান্য কিছু করার জন্যও, এমনকি অধ্যাপক ও গবেষকের পদটুকু পাওয়ার জন্যও প্রথম থেকেই তাঁকে নির্ভর করে থাকতে হ'ল ঔপনিবেশিক শাসকের দাক্ষিণ্যের উপর। ফলত, কংগ্রেসী আন্দোলনের মতই, 'আধুনিক', 'জাতীয়', বিজ্ঞান তৈরীর প্রয়াসের পাশাপাশি জগদীশচন্দ্র জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইংরেজের প্রতি দেখিয়ে গেছেন এক অদ্ভুত ধরনের হীনম্মন্যতা আর আনুগত্যের ভাব। আর তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর গবেষণার চৌহদ্দির ভিতরও প্রথম থেকেই রয়ে গেল বিরাট স্ব-বিরোধ—জাতীয় বিজ্ঞান তৈরী করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্রকে অবধারিতভাবেই এগুতে হ'ল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মডেলটা ধরেই। কারণ 'আধুনিক' বিজ্ঞানের আর কোনো মডেলই ছিল না তাঁর সম্মুখে।

বিজ্ঞান গবেষণার প্রতিটি পদক্ষেপে জগদীশচন্দ্রকে ক্রমশ বেশী করে জড়িয়ে পড়তে হ'ল এই স্ববিরোধিতার পাকে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কোর্টে গিয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিয়ম ধরে খেলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে হারিয়ে দেওয়ার প্রয়াসে নাকানি চোবানি খেতে লাগলেন জগদীশচন্দ্র। 'নাকানি-চোবানি' বলে খেলো করতে চাইছি না তাঁর প্রয়াসকে। বস্তুত, মহান ট্রাজেডির মহান নায়কের মতই মন

জগদীশচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল মহাভারতের কর্ণের উপাখ্যান। কর্ণের মত জগদীশচন্দ্রও লড়তে গেলেন এমন এক পরিস্থিতির সঙ্গে যা প্রায় অমোঘ নিয়তির মত শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত করল তাঁকে।

কাড়ে জগদীশচন্দ্রের জীবনকাহিনী। জগদীশচন্দ্রের খুব প্রিয় ছিল মহাভারতের কর্ণের উপাখ্যান। কর্ণের মত জগদীশচন্দ্রও লড়তে গেলেন এমন এক পরিস্থিতির সঙ্গে যা প্রায় অমোঘ নিয়তির মত শেষ পর্যন্ত বিধ্বস্ত করল তাঁকে। আবার কর্ণের মতই জগদীশচন্দ্রের লড়াইয়ের মূল মোটিভটা ছিল প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রোশ, বঞ্চিতের ভিতরকার জ্বালা। ঠিক যেমনটা ছিল কংগ্রেসের স্বাধীনতার লড়াইয়ের বেলায়। এইসব লড়াইয়ের মূল বৈশিষ্ট্যই হ'ল, প্রতিপক্ষের প্রতি বশ্যতা এবং তা থেকে উদ্ভূত হীনম্মন্যতা সংগ্রামীর মানসিকতার একেবারে গভীরে অভ্যন্তরীভূত (internalised) হয়ে তাকে পরিচালিত করে ঠিক

সেইসব মূল্যবোধের দিকে, যেগুলির দ্বারা প্রতিপক্ষ নিপীড়িত করে তাকে।

রাজনৈতিক লড়াইয়ের বেলায় এই আভ্যন্তরীভবন যে ধরনের বিকৃতির জন্ম দেয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার খুব ভাল নিদর্শন রয়েছে। জগদীশচন্দ্রের লড়াইটা ছিল অন্য প্রকৃতির। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে মডেল ধরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেরই বিপরীত এক আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানকে রূপ দিতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র প্রক্ষিপ্ত হলেন এমন এক আবর্তে যার উপর তাঁর নিজস্ব কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকা সম্ভব ছিল না। এবং এরই ঘূর্ণিপাকে একে একে প্রকট হতে থাকল তাঁর অবচেতনের বহুদিনকার নানান নিরুদ্ধ প্রবণতার সংঘাত যা ক্রমশ বেশী করে আচ্ছন্ন করতে থাকল তাঁর চেতনাকে। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানচেতনা হারাতে থাকল তার স্বনিয়ন্ত্রণ।

আগেই বলেছি, গোড়া থেকেই জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানমনস্কতায় স্বনিয়ন্ত্রণের অভাব ছিল। একদিকে জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞান গবেষণাকে বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁর বিশেষ ধরনের জাতীয়তাবোধের সংগে, এবং এ থেকে শুরু করে প্রবল একপ্রস্থ বাহ্য উপাদানের ও ঘটনাপ্রবাহের অধীন হয়ে পড়েছিল তাঁর গবেষণা। আর অন্যদিকে তাঁর গবেষণার মোটিভ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত অন্তর্জগতের নানান ধরনের ব্যর্থতাবোধ ও অবদমিত ভাবনাসঞ্জাত আত্মপ্রতিষ্ঠার তাড়না। সব মানুষেরই কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে এই ধরনের কোনো মোটিভ বা তাড়না থাকতে পারে কমবেশী পরিমাণে, জগদীশচন্দ্রের বেলায়ও ছিল। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানপ্রয়াস যত বেশী করে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর অনুরাগ-বিরাগের মনোভাবের দরুন ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হতে থাকল তত বেশী করে তাঁর অন্তর্লোকের নানান কল্পভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকল তাঁর কাজ। স্বল্প-দৈর্ঘ্যের বেতার তরংগ নিয়ে যে সাড়া-জাগানো কাজ দিয়ে তিনি শুরু করেছিলেন সে সংক্রান্ত আরো কিছু কাজের পর যখন তিনি উদ্ভিদ-শারীরবৃত্ত বিষয়ে কয়েকটি আবছা অনুমানের উপর ভিত্তি করে কাজ শুরু করলেন তখন থেকেই তাঁর কাজের স্বীকৃতি কমতে থাকল। আর ততই বাড়তে থাকল তাঁর জিদ। ক্রমশ অধৈর্য এবং অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকলেন তিনি। ভিতরে ভিতরে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বোধ যত বাড়তে থাকল, বাইরের দৃষ্টিভংগি হতে থাকল তত নির্বিচার এবং আশপাশের মানুষদের প্রতি তাঁর মনোভাব হ'তে থাকল তত বেশী কর্তৃত্ববাদী ও সংকীর্ণ। তবু এই পর্যায়েও তাঁর কাজের ভিতর মিশে ছিল আশ্চর্য কিছু অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলি ছিল সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু তারপর যখন তিনি জীব ও জড়ের ব্যবহারে ঐক্য সন্ধানে রত হলেন তখন তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা আচ্ছন্ন হয়েছে ঘন কুহেলিকায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ততদিনে খোলাখুলিভাবে ধর্মীয় রহস্যবাদী মতাদর্শের অধীন করেছেন তিনি। বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চাইতে সনাতনী ভারতীয় মতাদর্শের স্বপক্ষে প্রমাণ জোগাতেই বেশী ব্যস্ত হয়েছেন 'আচার্য' জগদীশচন্দ্র। জাতিগত এবং ব্যক্তিগত চরিতার্থতা লাভের তাড়না, ব্যর্থতাবোধ, রহস্যবাদ, সমস্ত মিলে মিশে শেষ পর্যন্ত বিচিত্র করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে জগদীশচন্দ্রের গবেষণাকে।

* * * * *

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানগবেষণা এতদিন পর্যন্ত সমাজ মানসে বড়রকম টানাপোড়েন সৃষ্টি করে নি। আজ কিন্তু তথাকথিত বস্তুবাদী বিজ্ঞানের আবেগ-অনুভূতিহীন বিরাট কাঠামোটা দেখে বিতৃষ্ণায় আশংকায় বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণাটা গোড়া থেকে আবার যাচাই করতে বসেছে মানুষ। বিজ্ঞানকে শুধুমাত্র 'বস্তুগত সত্যের' সন্ধান বলে না ভেবে আবেগ-অনুভূতিতে সম্পৃক্ত এবং মানসলোকের নানান অন্তর্লীন আশা-আকাংক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি একান্ত মানবিক প্রয়াস বলে ভাবা অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে আজ। এবং এরই ফলে পাশ্চাত্য সমাজে বিজ্ঞানকে ঘিরে সমাজমানস ও ব্যক্তি-মানসে বড়রকম দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে। দুইয়ের ভিতরকার এতদিনের ভার-সাম্যের সম্পর্কে চিড় ধরছে। বিজ্ঞানের সামাজিক বিশ্লেষণে এর বিষয়ীনির্ভর, আত্মগত দিকটি বেশী করে গুরুত্ব পাচ্ছে।

পুরণো সমাজ ব্যবস্থাটা তার সমস্ত পুরনো ট্রাডিশন নিয়ে আর পাঁচজন মানুষের ক্ষেত্রে যেমন বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রেও তেমনই অভ্যন্তরীভূত হয়ে থাকে মানসলোকের গভীরে। নতুন সত্যের সন্ধান স্বভাবতই দ্বন্দ্বের জন্ম দেয় এই মানসলোকের ভিতর এবং এই দ্বন্দ্বের ছাপ পড়ে বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানপ্রচেষ্টার উপর, এমনকি বিজ্ঞানী যে 'সত্য' আবিষ্কার করছে তার উপরও।

বস্তুত বিজ্ঞানী যে নতুন সত্যের সন্ধানে রত, তার সংগে পুরনো সমাজ ব্যবস্থার দ্বন্দ্বের কথা যখন বলা হয় তখন অনেকসময়ই বিজ্ঞানীর অন্তর্জগৎকে কার্যত উপেক্ষা করা হয়। আসলে কিন্তু লড়াইটা প্রধানত সংঘটিত হয় বিজ্ঞানীর অন্তর্জগতেই। কারণ, পুরণো সমাজ ব্যবস্থাটা তার সমস্ত পুরনো ট্রাডিশন নিয়ে আর পাঁচজন মানুষের ক্ষেত্রে যেমন বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রেও তেমনই অভ্যন্তরীভূত হয়ে থাকে মানসলোকের গভীরে। নতুন সত্যের সন্ধান স্বভাবতই দ্বন্দ্বের জন্ম দেয় এই মানসলোকের ভিতর এবং এই দ্বন্দ্বের ছাপ পড়ে বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানপ্রচেষ্টার উপর, এমনকি বিজ্ঞানী যে 'সত্য' আবিষ্কার করছে তার উপরও। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধ্যানধারণার সংগে এখানকার মানুষের মানসিকতার পার্থক্য গভীর।

সুতরাং প্রধানত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মডেলের উপর নির্ভরশীল আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা ভারতীয় বিজ্ঞানীর ব্যক্তিমানসে যে টানাপোড়েন সৃষ্টি করে সেগুলিকে ঠিকমত না বুঝলে শেষ পর্যন্ত সেগুলি এক প্রবল নিয়ামক শক্তির রূপ ধরে বিজ্ঞানগবেষণার ভিতর নানান বিচ্যুতি এবং বিকৃতির জন্ম দেয়। রামানুজন এবং সত্যেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানগবেষণার আবর্তধারায় নিজেদেরকে সংশ্লিষ্ট করতে অস্বীকার করে এবং অনেকটা পরিমাণে আত্মমগ্ন থেকে এই বিকৃতি এড়িয়েছিলেন, কিন্তু একইসংগে তাঁদের বিজ্ঞানগবেষণাও কার্যকারিতা হারিয়েছিল। মেঘনাদ সাহা, ভাবা, মহলানবিশ, এঁরা দ্বন্দ্বটাকে এড়িয়েছিলেন অন্যভাবে—বিজ্ঞান গবেষণা প্রায় ছেড়ে বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনভার নিয়ে এবং সরকারী বিজ্ঞাননীতি প্রণয়নে ও তার সমালোচনায় অংশ নিয়ে। এক্ষেত্রে অবশ্য আর এক প্রস্থ দ্বন্দ্বের ও বিকৃতির শিকার হতে হয়েছিল তাঁদেরকে, কিন্তু সে অন্য প্রসংগ। আর মুষ্টিমেয় যে কয়জন বিজ্ঞানী বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রটিকে শেষ পর্যন্ত ধ'রে থেকেও তাঁদের বিজ্ঞানচিন্তার নিয়ন্ত্রক শক্তিগুলিকে বুঝতে না পারার দরুন নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ব্যর্থ পরিণতির ভিতর, জগদীশচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

প্রবল পরিস্থিতির চক্রান্ত কিছুই না বুঝে রথের চাকা ঠিক করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছিলেন কর্ণ। বিজ্ঞানের সংগ্রামক্ষেত্রে ঠিক একইরকম উপলব্ধিহীনতায় নিজেকে নিঃশেষিত করলেন ভারতীয় বিজ্ঞানের মহান পুরুষ জগদীশচন্দ্র।

সূত্র : 1. আশিস নন্দী : অলটারনেটিভ সায়েন্সেস
(অ্যালায়েড পাবলিশার্স, নিউ দিল্লী, 1980)

2. যশভাই প্যাটেল : সত্যেন্দ্রনাথ বোস, অ্যান ইণ্ডিয়ান ফিজিসিস্ট
('লোকবিজ্ঞান সংগঠন, মহারাষ্ট্র'-এর পক্ষে প্রকাশিত, 1981)

পরিক্রমা

দু' হাজার সালে দশ হাজার মেগাওয়াট

দু হাজার সালের মধ্যে বিশ্বের তাবৎ মানুষের দুঃখকষ্ট প্রায় আর থাকবে না! কথাটা দৈববাণীর (!) মত শোনাচ্ছে; কিন্তু দু'হাজার সালের মধ্যে পৃথিবীর সকলের জন্য স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থার নানান ফরমান শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের কাছ থেকে।

এত হৈচৈয়ের মধ্যে যে জিনিষটির প্রতি পৃথিবীর কোন দেশই নজর দেন নি—আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী সে অভাব পূরণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন দু'হাজার সালের মধ্যে আমরা চাই '10,000 মেগাওয়াট (MW) পারমাণবিক বিদ্যুৎ'! এই খবর শুনে ভারতের নানান বন্ধু দেশ কারিগরী সাহায্য দানের জন্য হুটোপাটি শুরু করেছেন। অবশ্য জানি না আসল হুটো-পাটি হয়তো আড়ালে আগেই শেষ হয়েছে। তারপর হয়েছে ঘোষণা এবং তারপর হুটোপাটি দেখানোর প্রকাশ্য পর্ব। সোভিয়েত রাশিয়াও এ ব্যাপারে উদার সহযোগিতার আশ্বাস জানিয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য গত পনের বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফলে ভারতের বর্তমান পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা 860 MW। যদিও প্রকৃত উৎপাদন এর বিশ পঁচিশ শতাংশ। এই দশকের শেষে উৎপাদন ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা 1800 MW। অর্থাৎ দশ বছরে আট হাজার মেগাওয়াট !! এত করেও সাধের পারমাণবিক শক্তি দেশের চাহিদার দশ শতাংশও হতে পারবে না। তবে কারিগরী রপ্তানীকারী দেশের কিছু বাণিজ্য হবে এবং আমরা পাবো বন্ধুত্বের উষ্ণ স্পর্শ।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিল্লীর ঔপনিবেশিক কায়দার শাসন ব্যবস্থায় নানাভাবেই বঞ্চিত। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যাপারেও তার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। তাতে শাপে বর হয়েছে বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু হালে বামফ্রন্ট সরকারের এই বঞ্চনার প্রতি নজর পড়েছে। শোনা যাচ্ছে দাঁতনে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের দাবী নিয়ে দিল্লীর দরবারে তদ্বির তদারক শুরু করেছেন। অর্থাৎ গায়ে পড়ে জঞ্জালের বোঝা কাঁধে নিতে চাইছেন। অবশ্যি তাতে কিছু এসে যেত না, যদি না বিরাট অঞ্চলে বেশ কিছু মানুষ নিছক নিজেদের অজ্ঞতার কারণে মারাত্মক ধরনের জীবনের ঝুঁকিতে না পড়তেন।

পরমাণু বিদ্যুতে অরুচি

"রীগান সরকারের বহু চেষ্টা-চরিত্র সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত উদ্যোগ আয়োজনে ক্রমশ ভাঁটার লক্ষণ সুস্পষ্ট। নতুন কোন প্ল্যান্টের চুক্তি হচ্ছে না, কয়েকটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েও বাতিল হয়ে গেছে, বিজ্ঞানের সবচেয়ে ভালো ছাত্ররা আর আগের মত নিউক্লিয়ার এঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে পড়াশুনোয় আকৃষ্ট হচ্ছে না। ক্রমে অধিক সংখ্যক আমেরিকাবাসীর মনে পারমাণবিক শক্তির সম্ভাবনা বিষয়ে নানা সন্দেহ বৃদ্ধি এর অন্যতম প্রধান কারণ। এক সময় এখানকার ওপর তলার মানুষ এমন কি রামপন্থীদেরও জোর সমর্থন পেয়েছিল পারমাণবিক শক্তির বিষয়টি। কিন্তু আজ সচেতন এবং ওয়াকিবহাল মানুষ পারমাণবিক শক্তিকে মোটেই কার্যকর বিকল্প বা কাম্য বলে মনে করেন না। এর খরচ সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে বিজ্ঞানী মহলের মত দ্বিধা বিভক্ত। যদিও নীতিগতভাবে শক্তি সমস্যার বিষয়টি অন্যভাবে দেখার পক্ষপাতী এনারা।"

সূত্র ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা Transaction Society' র জুলাই-আগষ্ট '83 সংখ্যায় Stanley Rothman এর প্রবন্ধ Contorting Scientifie Controversies.

সেদিনের পর

'দি ডে আফটার' নামক ছবিটির কথা অপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন। একটি ছবিকে ঘিরে এত জল্পনা-কল্পনা, বিতর্ক, উচ্ছ্বাস, বোধহয় টেলিভিসন ছবির ইতিহাসে আর ঘটেনি। সাধারণভাবে ফিল্মের বেলায়ও এ অতি বিরল ঘটনা।

যাইহোক, মূল কথায় আসা যাক। এযাবৎ প্রকাশিত সংবাদের সারমর্ম ঃ আমেরিকান ব্রডকাষ্টিং, কর্পোরেশন একটি বেসরকারী সংস্থা, টেলিভিশনে দেখাবার জন্য দু ঘণ্টার এই ফিল্মটি তৈরী করেছে এবং গত 20শে নভেম্বর প্রদর্শিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এটি ঝড় তুলেছে। যদিও ছবিটি রাজনীতি বর্জিত তবুও একে কেন্দ্র করে উঠেছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। সরকার বিব্রত এবং আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হয়ে উঠেছে, শান্তিকর্মীরা একে স্বাগত জানিয়েছে তবে এর রাজনীতি নিরপেক্ষতার সমালোচনাও করেছেন অনেকে। শিশু ও কিশোরদের উপর এর প্রভাব নিয়ে অভিভাবক ও মনোবিজ্ঞানীরা চিন্তিত। দিন দিন ছবিটির জন-প্রিয়তা বেড়ে চলেছে। ইয়োরোপেও দেশে দেশে ছবিটির জন্য উন্মুখ আগ্রহ। ইতিমধ্যে পশ্চিম জার্মানীকে ছবিটি উত্তাল করে তুলেছে। না, কোন শৈল্পিক পরাকাষ্ঠার ছবি এটি নয়। ইয়োরোপের একটি ছোট্ট বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক শহরে একটি কাল্পনিক পরমাণু যুদ্ধের তাৎক্ষণিক ও পরবর্তী ফল কিরকম হবে তারই নিখুঁত, বাস্তবসম্মত, দরদী ছবি এটি। যদিও অনেকেরই মতে বাস্তবের সম্ভাব্য ভয়াবহতা এতে অর্ধেকও ফুটে ওঠে নি। ইয়োরোপে ক্রুইজ-পারশিং ক্ষোপনাস্ত্র যখন মোতায়েন করা শুরু হয়েছে ঠিক সেই সময় এই ছবি রেগান প্রশাসনকে একটু বিব্রত করে তুলেছে বৈকি!

[সূত্র ঃ স্টেট্‌সম্যান, আজকাল, দি টাইম্‌স্ (লণ্ডন)]

'যোজনা'র ফসল

বহু বছর ধরে কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশনের পক্ষে তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ সরকারী পত্রিকা 'যোজনা' প্রকাশ করে আসছে। ইংরেজী এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় এটি প্রকাশিত হয়। যেহেতু 'যোজনা' সরকারী মুখপত্র এবং সরকারের পরিকল্পনা, কর্মপন্থা ইত্যাদিই আলোচিত বা ঘোষিত হয়—জনসাধারণ তো বটেই, এমনকি সরকারী কর্মী, আমলা, মন্ত্রীরাও এটি কেউ পড়ে দেখেন বলে মনে হয় না। এই নিয়মের হঠাৎ ব্যতিক্রম ঘটল 15 আগষ্ট, 1983র বিশেষ সংখ্যাটির ক্ষেত্রে। "বৈজ্ঞানিক মেজাজ নাকি ট্রাডিশনের বন্দীদশা" এই বিষয়কেন্দ্রিক সংখ্যাটিতে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পরিকল্পনাবিদের ও শিক্ষাবিদদের প্রবন্ধ এবং সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের সর্বাঙ্গীন ব্যর্থতার পেছনে তাঁরা দেখেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। এবং এমনকি, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা ও কর্মকান্ডের প্রতি সরকারী দাক্ষিণ্য।

মজার ব্যাপার হল, যোজনায় এই বিশেষ সংখ্যাটির চাহিদা হঠাৎই খুব বেড়ে যায়। সংবাদপত্রে প্রকাশ, উচ্চ সরকারী মহল থেকে এটির প্রচার বন্ধের চেষ্টাও হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যেই সংখ্যাটি নিয়মিত গ্রাহকদের অধিকাংশকেই পাঠানো হয়ে গিয়েছিল। পরে অবশ্য এটি আর কিনতে পাওয়া যায় নি!

উক্ত সংখ্যা 'যোজনার' দ্বিতীয় কভারে নেহরু সেন্টার কর্তৃক প্রস্তুত 'বিজ্ঞানমনস্কতা সম্পর্কে একটি বিবৃতি' * প্রকাশিত হয়েছে—যাতে বলা হয়েছে 'অনুসন্ধিৎসা এবং প্রশ্ন করা বা জিজ্ঞাসিত হওয়া বৈজ্ঞানিক মেজাজের মূল কথা' এবং 'অবাধ যোগাযোগ বৈজ্ঞানিক মেজাজ গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত'ও', আর এ সংখ্যার 'যোজনা' কে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেল উচ্চতম সরকারী মহলের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরাকাষ্ঠা। কি অদ্ভুত পরিহাস!

[সূত্র ঃ স্টেট্‌সম্যান 22.8.83 'Publication stirs Hornet's Nest]

* এই বিবৃতিটির একটি অংশের বঙ্গানুবাদ 'বি-ও-বি'র এই সংখ্যায় আছে।
—সঃ মঃ [বি-ও-বি]

কমনওয়েলথ সম্মেলন, নেতাদের বিশ্রাম ও বৃক্ষচ্ছেদন

না, এশিয়াড, জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন বা সাম্প্রতিকতম কমনওয়েলথ সম্মেলন ভারতের মানসম্মান কতটা বাড়িয়েছে বা এসব সম্মেলনের জন্য কত অর্থব্যয় হয়েছে সেসব প্রশ্ন তুলছি না। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া বা বিশ্বশান্তিতে এসবের অবদান নিয়েও কোন বাগাড়ম্বর করার ইচ্ছে নেই। কমনওয়েল্‌থ নেতৃবৃন্দের গোয়াতে তিনদিনের অবসর যাপনের খরচ প্রতি ঘণ্টায় 60লক্ষ টাকা বলে যাঁরা হিসেব কষে দেখিয়েছেন, সেই সিটিজেনস ফর সিভিল লিবার্টি এন্ড ডেমোক্রেটিক রাইটস—এর বঙ্কিম সমালোচনাও আমাদের আলোচ্য বিষয় হতে পারেনা, কেননা নেতাদের বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা অন্য কারো পক্ষে বোঝা সত্যিই কঠিন, আর প্রত্যক্ষ খরচ যাই হোক, পরোক্ষ অবদানের হিসেব তো কেউ করে দেখায় নি!

কিন্তু সত্যি সত্যি গভীর উদ্বেগের বিষয় যেটা তা হল নেতাদের নিরাপত্তার অজুহাতে গোয়াতে হাজার তিনেক বড় বড় গাছ কেটে ধ্বংস করা। ঐ সব গাছের আড়াল থেকে দুষ্কৃতকারীরা যে কোন কুকর্ম করে ফেলতে পারতো ঠিকই, কিন্তু গাছগুলিকে কেটে না ফেলে (এবং তার জন্য আবার গাছের মালিকদের গাছ পিছু সাত টাকা ক্ষতিপূরণও দিয়েছেন মহানুভব সরকার!) কোনভাবেই কি নিরাপত্তাবিধান সম্ভব ছিল না? তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে যে ভারত পরিবেশ মন্ত্রক সৃষ্টিতে অন্যতম পথিকৃৎ এবং যে কৃতিত্বের দাবীদার অবশ্যই এদেশের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর জ্ঞাতসারে এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারে না বলে অনেকের অনুমান। আমি যাঁদের কথার উপর গভীর আস্থা পোষণ করি তাঁদের একজনের মতে—ব্যাপারটি ঘটেছে গোয়ার কিছু প্রভাবশালী কাঠ ব্যবসায়ীর কৌশলে। কমনওয়েলথ নেতৃবৃন্দের গোয়ায় আগমন ও মূল্যবান অবসর বিনোদন অনেককে অনেক কিছু দিয়েছে, কাঠ ব্যবসায়ীরাই বা বাদ যাবে কেন?

[সূত্র ঃ আজকাল, 28 নভেম্বর ও 12 ডিসেম্বর 1983]

স্মল ইজ বিউটিফুল

পরিকল্পনা পর্ষদের ঘোষণায় জানা গিয়েছিল আগামী সপ্তম পরিকল্পনায় ছোট ছোট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাধ্যমে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে। অত্যন্ত সাধু প্রস্তাব বলতেই হবে। কারণ পরিবেশ বিজ্ঞানীদের বিবেচনায় নদীতে বড় বড় বাঁধ দিয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়া পরিবেশের ভারসাম্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তাই ছোট ছোট বাঁধের পরিকল্পনা অভিনন্দনযোগ্য।—কিন্তু প্রস্তাব এত সাধু বলেই সন্দেহ, এর ভবিষ্যৎ কি?

Morning shows the day—প্রবাদে আস্থা রাখলে বলতে হয় গতিক সুবিধের নয়। কাজ ত্বরান্বিত করতে পরিকল্পনা পর্ষদ রাজ্যগুলির জন্য 100 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। কিন্তু অর্থের টানাটানির (!) অজুহাতে সে টাকা মঞ্জুর করা যায় নি।

মোটা দাগের হিসেবের ভিত্তিতে বলা যায়, আমাদের দেশে এক মেগাওয়াটের চেয়ে কম ক্ষমতাসম্পন্ন এমন বিশ হাজারের মত ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখুনিই হতে পারে। এ জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বা মালমশলার জন্য কারোর কাছে হাত পাততে হবে না। Sophisticated Technology বলতে যা বোঝায় তার নামগন্ধ লাগবে না এজন্য। সাধারণ শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামের লোকজনই পারবে এর দেখাশোনার কাজ। এবং সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য, এটা কেন্দ্রীভূত উৎপাদন-ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা।

প্রসঙ্গক্রমে চীনের উদাহরণ টানা যায়। চীনে প্রায় এক লক্ষ ছোট ছোট বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে উঠেছে যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা 9000 মেগাওয়াট। গত দশকেই গড়ে উঠেছে 40,000 অনুরূপ ইউনিট। ভারতে এর সংখ্যা মাত্র 83টি। মোট উৎপাদন ক্ষমতা 140 মেগায়াট।

সুমাচারের মত অনুসারে—'ইউনিট ছোট হওয়া ভাল'।

ইউনিটের সংখ্যা ছোট হওয়া—তাও কি ভাল?

বিজ্ঞান প্রযুক্তি জীবিকা কোন পথে

'বিজ্ঞান প্রযুক্তি জীবিকা কোন পথে'—এ ধরনের আলোচনা ছোট একটি প্রবন্ধের পরিসরে প্রায় অসম্ভব। হলেও একমাত্র বিশেষজ্ঞরাই পারেন সে কাজ। সমসাময়িক কালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য ও গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করা এবং তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা বিশেষজ্ঞের কাজ। অথচ আমরাই কলে কারখানায় মিলে খনিতে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অফিসে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবহনে গতরে খাটছি। অভিজ্ঞতার শরিক আসলে আমরাই। আমরাই নতুন পুরানো হরেক ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত, ক্ষত বিক্ষত, বিধ্বস্ত, প্রতি মুহূর্তে। অথচ গুছিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি না, পারি না অভিজ্ঞাতার সার সংকলন করতে। তবে আমরা যখন পরস্পরে মুখোমুখি কথা বলি, আলোচনা করি তখন সাদামাটা ভাষায় অনেক কথাই ব্যক্ত করি। —বলি অনেক গূঢ় কথাই। অনেক কিছুর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে শুরু করি। আমরা বিশেষজ্ঞ নই। একা একা ভাবনায় দক্ষ নই। কিন্তু পাঁচ জনে মিলে ভাবলে বুঝি অনেক কিছুই।

এই পাঁচ জনে ভাবনার উপায় খুঁজছি অনেকেই। অথচ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি আমরা। তাই আসুন আমরা অ-বিশেষজ্ঞরা পত্রিকার এই পাতাটি ব্যবহার করি পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে। জীবন জীবিকা নির্বাহের পথে কত বিচিত্র কাজেই না লিপ্ত আমরা। সেখানে আমরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যেন মানুষ নই। আমাদের নিজস্ব চিন্তা বা স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। —জড়বৎ যন্ত্র যেন। আসুন ছোটবড় ঘটনার মাধ্যমে বিবৃত করি আমাদের মনের কথা। প্রকাশ করি আমাদের কাজের মধ্যে পাওয়া আনন্দ বেদনা অবদমন ক্লান্তি আবসাদ অসম্মান একঘেঁয়েমি ঘৃণা ও গ্লানির অনুভূতিগুলি।

ক্ষমতা যাদের অনেক বেশী, অনেক অর্থ অনেক উপকরণ যাদের নাগালে তারা কত দ্রুততায় নিজেদের মধ্যে এই বোঝাপড়ার কাজটি করে থাকে। অথচ আমরা কেবলই দেখি আর শুনি। একই ভাবনার মানুষ যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন তাদের মধ্যে ভাবনার আদান প্রদান করে সংহতি গড়ে তুলতে পারি না।

প্রসঙ্গক্রমে, প্রযুক্তির কথা এসে পড়ে। আধুনিক প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতা লক্ষ্য করি মাস কমিউনিকেশন মিডিয়ার আকার প্রকৃতিতে। রেডিও টেলিভিশন ফিল্ম পত্রিকা সারা দেশের মানুষকে দুটি ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। একপক্ষ, যাদের হাতে এই ব্যবস্থা, তারা একনাগাড়ে প্রচার করে চলেছে তাদের আদর্শ সংস্কৃতি ভাবনা। আর একদিকে রয়েছে বিশাল অংশ মানুষ যারা কেবল শ্রোতা বা দর্শক মাত্রই। এক পক্ষকে বোবা রাখাই এই মিডিয়ার বৈশিষ্ট্য।

তুলনাটা একটু বৃহৎ পটভূমি ধরে হল। কিন্তু এটাই বলতে চাই যে ওরা বড় পক্ষ। শোনাতে ওরা চায়। শোনাতেই চাইবে। আমরা তা চাই না আমরা জানতে চাই। জানতে চাই বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে নয়। নিজেদের মধ্যে ভাবনার আদানপ্রদান করে। গুচ্ছ গুচ্ছ রঙীন পত্রিকার পাহাড় ডিঙিয়ে সাদামাটা এই পত্রিকাখানা যখন আপনার হাতে উঠেছে তখন নিশ্চই আপনি আমাদের কাছের লোক। আসুন 'এক পক্ষ কেবল কথা বলবে'—এই রেওয়াজ ভাঙি। গড়ে তুলি উভয়মুখী অভিজ্ঞতা প্রবাহের বিকল্প প্রক্রিয়া।

স্টান্ট নয়—আন্তরিক এই আহ্বান। কিছু অভিজ্ঞতা থাকলে অনুমান করতে পারবেন সামান্য গুটিকয়েক পাতার এই পত্রিকার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কতই না ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়। তম্বির তোয়াজ করতে হয় কত বড়কর্তার। গুটি কয়েক টাকার বিজ্ঞাপনের জন্য দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে কত কটাক্ষ কত অপমান সইতে হয়। সইতে হয় সরকারী নিয়মতান্ত্রিকতার ক্লান্তিকর হুজ্জত। এত ঝক্কির শেষে যে ক'পাতা ছেপে বেরোল, যে সামান্য সুযোগ সৃষ্টি হল তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হোক চাইব না কি? আপনিও কি তা চান না?

তাহলে লিখুন এই পাতার জন্য। যিনি কারখানায় আছেন কি খনিতে আছেন, কলেজে কি বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন হাসপাতালে কি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে আছেন, অফিসে কি পরিবহন ব্যবস্থায় আছেন সকলে লিখুন। লেখা চারশ থেকে হাজার শব্দের মধ্যে হলেই চলবে।

বি-ও-বি-র বৈচিত্র ও উপযোগিতা বাড়াতে এতে 'দৃষ্টিকোণ,' 'বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-জীবিকা কোন পথে', 'সমীক্ষা' বিভাগগুলি আমরা খুলছি! ভবিষ্যতে আরো কিছু কলম খোলার ইচ্ছা রইল। সব সংখ্যায় সব কলম নাও থাকতে পারে। তবে কলম গুলির উপর আমরা জোর দিতে চাই। পাঠকদের কাছ থেকে এই সব বিভাগের জন্য লেখা আহ্বান করছি। যে সব লেখা প্রকাশের জন্য মনোনীত হবে সেগুলির লেখক ও লেখিকারা এক বছরের জন্য বিনামূল্যে বি-ও-বি উপহার পাবেন। **সম্পাদক মণ্ডলী/'বি ও বি'**

বিশদফাতে বলছে লোক পরিবার সব ছোট হোক

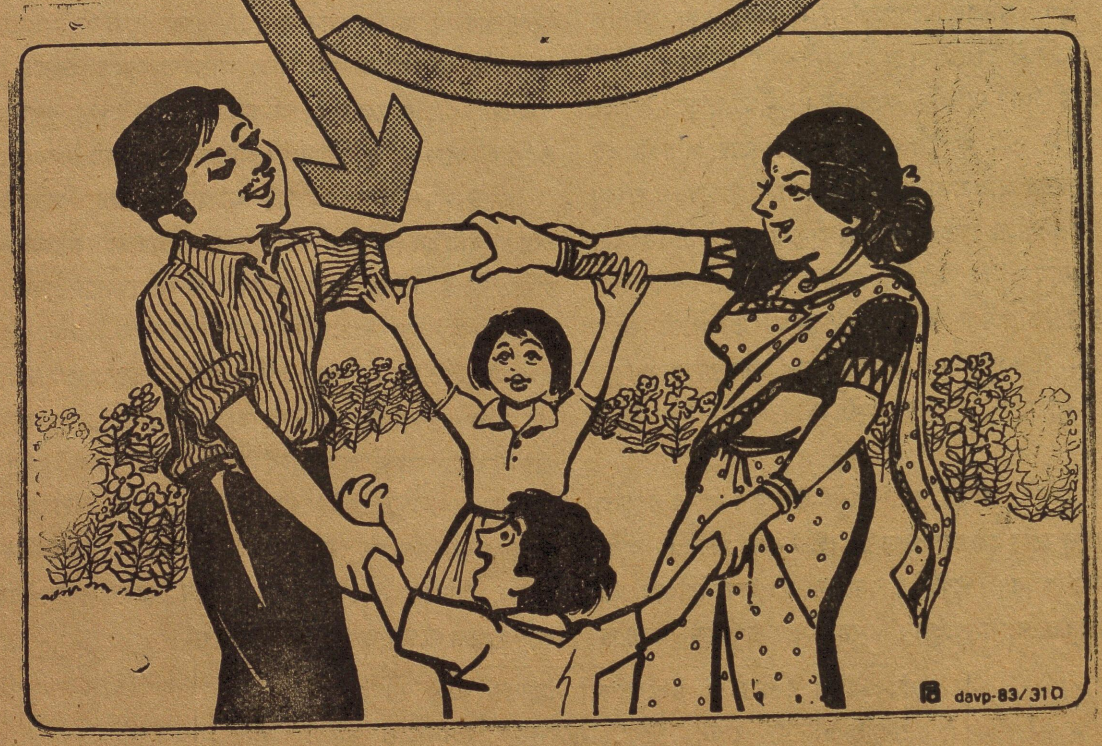

সমীক্ষা

সুতোকলের ব্যাধি বিসিনোসিস

[মহারাষ্ট্র লোকবিজ্ঞান সংগঠনের সমীক্ষার রিপোর্ট]

কোনো কোনো কলকারখানার বাতাসে বিশেষ ধরণের কিছু কিছু কণা প্রচুর পরিমাণে ভেসে বেড়ায়। যেমন সিমেণ্ট আর এস্‌বেস্‌টস কারখানায় সিমেণ্ট ও এস্‌বেটসের সূক্ষ্ম কণা, সুতীর কাপড়ের মিলে তুলোর আঁশ, কয়লা বা পাথরের খনিতে ঐ পদার্থগুলির গুঁড়ো, ইত্যাদি। নিঃশ্বাস নেবার সময় এইসব কণা শ্রমিকদের ফুসফুসে ঢুকে পড়ে। এই ধরণের যে কোনো কণা থেকেই ফুসফুসের অসুখ হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন ধরণের কণা থেকে হওয়া অসুখের প্রকৃতি আলাদা। এসবেস্‌টেসের কণা থেকে হয় এস্‌বেস্‌টোসিস্‌, পাথরের খনিতে হয় সিলিকোসিস, তুলোর আঁশ থেকে হয় বিসিনোসিস্‌। এই অসুখগুলির প্রত্যেকটিতেই শ্বাসকষ্ট অন্যতম লক্ষণ, তবে শরীরের ওপর এদের দীর্ঘকালীন প্রভাব কিছু আলাদা আলাদা।

কিছু শংকা, কিছু প্রশ্ন আমাদের মনে জেগেছে। মোট কতজনের এই সব রোগ হয়? এই সমস্ত অসুখ হলে কত জন চিকিৎসার সুযোগ পায়? এই রোগগুলি বন্ধ করার জন্য অথবা রোগ হবার পর শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমরা এগুলির মধ্যে একটিকে বেছে নিয়েছি—বম্বের কাপড়ের কলে তুলোর আঁশ থেকে হওয়া অসুখ বিসিনোসিস্‌।

এই অসুখটিকে বোঝার জন্য ডাক্তারী কাজকর্ম হয়েছে গত তিরিশ বছর, যার সূত্রপাত হয়েছিল বৃটেনের কাপড় কলে। আমরা খবর পেলাম, বছর কয়েক আগে জনাকয়েক ডাক্তার বোম্বের মিলে বিসিনোসিসের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং তার একটি বিস্তৃত প্রতিবেদনও প্রস্তুত করেছিলেন। এই চিকিৎসকেরা তিনটি কাপড় কলের হাজারখানেক শ্রমিককে পাঁচ বছর (1970-75) ধরে পরীক্ষা করেছিলেন। বিসিনোসিস্‌ সত্যিই বুকের অন্যান্য অসুখ (যেমন ক্রনিক ব্রংকাইটিস্‌) থেকে আলাদা কিনা—এটা জানাই ছিল ওই পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই রিপোর্টটি আমাদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে এমন কিছু প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে যার উত্তর আমরাও চাইছিলাম।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন ঃ বোম্বাই এর মিল শ্রমিকদের মধ্যে মোট কতজনের বিসিনোসিস্‌ আছে?

প্রতিবেদনটিতে দুধরনের বিসিনোসিসের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। তবে সব মিলিয়ে এই পরীক্ষায় শতকরা সতেরোজন শ্রমিককে বিসিনোসিস্‌ রোগাক্রান্ত দেখা গিয়েছিল। যে সমস্ত বিভাগে তুলোর আঁশ বেশি হয় সেখানে এই রোগও বেশি হয়। যেমন কার্ডিং সেকশনে এক চতুর্থাংশেরও বেশী শ্রমিকদের বিসিনোসিস্‌ ছিল।

আমাদের আরেকটি জিজ্ঞাসা ছিল, এই অসুখের লক্ষণ কি? এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, কাজের সময় হাঁপানো বা শ্বাসকষ্ট এবং বুকের জমাট ভাব এই অসুখের লক্ষণ। এই লক্ষণগুলির সংগে কাজের সময় কাশিও যদি যোগ হয় ত' তাকে বিসিনোসি-A'র লক্ষণ বলা চলে। বাকি লক্ষণগুলি না থেকে, শুধুই কাজের সময় কাশি হলেও তাকে বিসিনোসিস্‌ A'র লক্ষণ বলা হয়।

পরের প্রশ্ন—এই অসুখগুলির বিভিন্ন পর্যায় কি? চিকিৎসকরা এই অসুখের তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম দুটি অবস্থায় লক্ষণগুলি রোজ দেখা যায় এবং শুধু কাজের সময়েই নয় অন্য সময়েও থাকে। তৃতীয় অবস্থার লক্ষণগুলির সংগে ক্রনিক ব্রংকাইটিসের মিল আছে।

বিসিনোসিস এবং ক্রনিক ব্রংকাইটিসের মধ্যে পার্থক্য টানা অত্যন্ত জরুরী। বিসিনোসিস একটি পেশাজাত ব্যাধি (occupational disease)। অন্যদিকে ক্রনিক ব্রংকাইটিস পেশাজনিত ব্যাধি নয়। যদি প্রমাণ করা যায় কোনো শ্রমিকের বিসিনোসিস হয়েছে তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে। ক্রনিক ব্রংকাইটিসের কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।

বিসিনোসিসের চিকিৎসা কি? প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় শ্রমিককে তুলোর আঁশে দূষিত পরিবেশ থেকে সরিয়ে অন্য কোন বিভাগে বদলী করা যেতে পারে। এতে সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু তৃতীয় অবস্থায় পৌঁছালে রোগীর ফুসফুস চিরদিনের মত কমজোর হয়ে যায়।

পরবর্তী প্রশ্ন খুবই জরুরী—তুলোর কলের শ্রমিকদের জন্য এ ব্যাপারে কি করা হচ্ছে এবং কি করা যেতে পারে? আমরা এই জটিল প্রশ্নের একটা দিক শুধু আলোচনা করছি—এই বিষয়ে আইন কি বলে?

1948-এর কারখানা আইনের সংগে আলোচ্য বিষয়টির সম্পর্ক আছে। এই আইনের অন্তর্গত রাজ্য সরকারগুলির হাতে মুখ্য পরিদর্শক নিযুক্ত করার অধিকার আছে। মুখ্য পরিদর্শক এবং তাঁর সংগে কাজ করেন এমন সহকারী পরিদর্শকদের কাজ হল কারখানা পরিদর্শন করা, কারখানায় যন্ত্রপাতি ক্ষতিকারক ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, পরিমন্ডল পরিচ্ছন্ন কিনা, শ্রমিকদের জন্য খাবার হল ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে কিনা এই সমস্ত দেখা। এছাড়া কারখানাগুলির স্বাস্থ্য পরিদর্শক (Medical inspector of factories) শ্রমিকদের

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে পারেন। পরিদর্শকের কাজে বাধা দেওয়ার অধিকার কারুরই নেই, কেউ বাধা দিলে আইনানুসারে তার সাজা হতে পারে। যদি পরিদর্শক কারখানার অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট না হন তাহলে তিনি কারখানার ম্যানেজারকে ওই অবস্থা পরিবর্তনের আদেশ দিতে পারেন। আদেশ না মানলে কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার ক্ষমতা মুখ্য পরিদর্শককে দেওয়া রয়েছে।

ফ্যাক্টরী অ্যাক্টে কারখানার ভিতরের পরিস্থিতি সম্বন্ধেও কিছু কিছু নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলি কতটা মানা হচ্ছে তা দেখার জন্য পরিদর্শক কারখানা-গুলিতে যান। এই নিয়ম অবশ্যই শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে : কারখানা পরিদর্শন করে কি ফল পাওয়া গেল একথা শ্রমিকরা জানতে চাইলে কি কখনো জানতে পারে ?

কারখানা আইনে ধুলো এবং ধোঁয়ার ওপরেও একটি পরিচ্ছেদ আছে। 14 নং পরিচ্ছেদ এবং মহারাষ্ট্র কারখানা আইনের (Maharashtra factory rules) চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম অংশে কাপড় কলের বিষয়ে কিছু নিয়মের উল্লেখ আছে। কিন্তু মিলের ভিতর কতটুকু মাত্রার বেশী পরিমাণে তুলোর আঁশ থাকা উচিত নয় এ সম্বন্ধে কোথাও কিছু লেখা নেই।

প্রতি হাজার লিটার হাওয়াতে তুলোর আঁশ এক মিলিগ্রামের বেশী না হওয়াই উচিত—এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকরা একমত। কারো কারো মতে এই মাত্রাটিও যথেষ্ট বেশী।

যে চিকিৎসকরা বোম্বাই-এর মিলে বিসিনোসিস-এর পরীক্ষা করেছিলেন তাঁরা জায়গায় জায়গায় হাওয়াতে তুলোর আঁশের পরিমাণ মেপেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন কোনো কোনো এলাকায় তুলোর আঁশ প্রতি হাজার লিটারে এক মিলিগ্রামের থেকে কুড়ি গুণ বেশী ছিল।

ফ্যাক্টরী অ্যাক্টে বিভিন্ন ধরনের পদার্থের ব্যবহারজাত অসুখের কথাও আছে। 'নোটিফায়েব্‌ল ডিজীস' (Notifiable disease)-এর একটি তালিকা এর অন্তর্গত। এই অংশে কাঁচ, পারা, ম্যাঙ্গানীজ, বেনজিন ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থজাত অসুখের আর এসবেসটোসিস এবং সিলিকোসিস-এর কথাও আছে। 1976-এ বিসিনোসিস কেও এই তালিকার অন্তর্গত করা হয়েছে।

'নোটিফোয়েব্‌ল' অসুখ মানে কি ?

যদি কোনো অসুখ উপরোক্ত তালিকার অন্তর্গত হয় তাহলে কোনা কারখানার ম্যানেজার বা কোনো ডাক্তার কোনো শ্রমিককে সেই রোগগ্রস্ত দেখলে আইনানু-সারে তখনই তা রাজ্যের মুখ্য কারখানা পরিদর্শককে জানাতে বাধ্য থাকবেন। আমরা মুখ্য পরিদর্শক এবং কারখানার স্বাস্থ্য পরিদর্শক (Medical Inspector of Factories)-এর অফিসে অফিসারদের প্রশ্ন করেছিলাম বছরে কত জন বিসিনোসিসের রোগীর খবর তাঁদের কাছে পেঁছায় ?

উত্তর পেলাম, 1976 থেকে (অর্থাৎ যবে থেকে বিসিনোসিসকে Notifiable disease হিসাবে ধরা হয়েছে) আজ অবধি একটিও রোগীর খবর তাঁদের কাছে পেঁছয়নি।

1948-এর Employees State Insurance Act অনুযায়ী বহু কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক Employees State Insurance পরিকল্পনার আওতায় পড়েন। কাজের সময় দুর্ঘটনা ঘটলে শ্রমিকদের E S I করপোরেশন থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। উপরোক্ত Act-এর তৃতীয় ভাগে পেশাজাত ব্যাধির উল্লেখ আছে।

পেশাজাত ব্যাধি কি ?

যে সমস্ত অসুখ পেশাজাত ব্যাধির তালিকায় আছে, সেগুলির উদ্ভব কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি থেকে। যদি কোন শ্রমিক (যে ওই পরিকল্পনার আওতায় পড়ে) এমন রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় যা এই তালিকায় পড়ে তাহলে নিয়মানুসারে ই. এস. আই অধিকর্তা ওই শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেবেন।

বিসিনোসিসের নাম কি পেশাজাত ব্যাধির তালিকায় আছে ?

আমরা যে তালিকাটি দেখেছিলাম তাতে বিসিনোসিসের নাম ছিল না। কিন্তু আমরা ফীল্ড ইনসুরেন্স অফিসের অফিসারদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তাঁরা বললেন, বছর কয়েক আগে এটিকে পেশাজাত ব্যাধির তালিকার অন্তভুর্ক্ত করা হয়েছে।

এর পর আমাদের প্রশ্ন ছিল : বিসিনোসিসের জন্য কতজন শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর পেলাম যে আজ অবধি কর্পোরেশনের কার্যালয়ে এবিষয়ে একটি কেস-ও আসেনি। আজ অবধি একজন শ্রমিক-ও বিসিনোসিসের জন্য ক্ষতিপূরণ পায়নি। স্বভাতই প্রশ্ন জাগে : উপরোক্ত ডাক্তারী রিপোর্ট থেকে অসুখটির যে ব্যাপকতার আভাস পাওয়া যায়, যদি সত্যিই তাই হয়, তাহলে রাজ্যের কারখানাগুলির মুখ্য পরিদর্শকের এবং ই. এস. আই কর্পোরেশনের কার্য্যালয়ে আজ অবধি একটি কেস-ও আসেনি কেন ?

আমরা কাপড় কলের কিছু শ্রমিকের সঙ্গে কথা বলেছি। এই অসুখের কিছুকিছু লক্ষণ তাঁরা নিশ্চয় অভিজ্ঞতা থেকে চিনে নিয়েছেন। তাঁরা নিজেরাই আমাদের বলেছেন, যে সব বিভাগে তুলোর আঁশ বেশী থাকে সেখানে শ্রমিকদের কাশি এবং শ্বাসকষ্টও বেশী হয়। কিন্তু তাঁরা এমন কোনো শ্রমিককে জানেননা যাঁকে ডাক্তার বিসিনোসিস রোগাক্রান্ত বলে সনাক্ত করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ-ই আগে বিসিনোসিস্ শব্দটি শোনেননি।

আমরা ই. এস. আই কর্পোরেশনের এক রেজিস্টার্ড ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। এই ডাক্তার কাপড় কল এলাকায় কমপক্ষে 20-25 বছর চিকিৎসা করছেন। প্রথমে ইনি আমাদের বললেন যে পেশাজাত অসুখ শ্রমিকদের অত্যন্ত কম হয়। কিন্তু কথায় কথায় আমরা জানতে পারলাম যে খোদ ডাক্তারবাবুর-ই বিসিনোসিস সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই।

প্রশ্ন : আমাদের ডাক্তাররা এই অসুখ এবং তার লক্ষণ সম্বন্ধে কতটা ওয়াকিফহাল ? এই বিষয়ে ডাক্তারদের শিক্ষা দেওয়া জরুরী নয় কি ? কি কারণে ভারপ্রাপ্ত সরকারী অফিসগুলিতে এই অসুখের খবর পেঁছায় না ?

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

ডাক্তার এবং শ্রমিকদের এই রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞতা একটি কারণ ঠিকই, কিন্তু এটাই কি একমাত্র কারণ ?

আরও প্রশ্ন ঃ এতক্ষণ আমরা বিসিনোসিস নিয়ে আলোচনা করছিলাম। এর সম্বন্ধে বোম্বের ডাক্তাররা একটা প্রতিবেদন তৈরী করেছেন। কিন্তু এস-বেসটস বা সিমেন্ট নিয়ে কাজ যাঁরা করেন তাঁদের ওপর এই ধরণের কোনো পরীক্ষা হয়েছে কি ? কিংবা কয়লা অথবা পাথর খনির শ্রমিকদের ওপর ? এই সমস্ত কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে কোনো না কোনো কণা অনেকটাই থাকে এবং ফুসফুসের ওপর তার প্রভাব পড়ে। উপরন্তু এসবেসটোসিস এবং সিলিকোসিস তো বিসিনোসিসের থেকেও বেশী বিপজ্জনক রোগ। ওই অসুখে ভুগছেন এমন শ্রমিকদের নিয়ে পরীক্ষা করা কি জরুরী নয় ? কারখানাগুলির মুখ্য পরিদর্শক এবং কারখানাগুলির স্বাস্থ্য পরিদর্শক কি এ বিষয়ে মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিউটে কোনো পরীক্ষা করিয়েছেন ? পরীক্ষার পর যে রিপোর্ট তৈরী হল তা সর্ব-সাধারণের জন্য প্রকাশিত হোক—এটা কি উচিত নয় ?

শিল্প উদ্যোগে তৈরী জিনিস আমাদের সকলের উপকারে লাগে। কিন্তু এই জিনিসগুলি বানাতে বানাতে যে শ্রমিকরা নিজেদের স্বাস্থ্য নষ্ট করেছেন তাঁদের প্রতি কি আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই ?

এই সমীক্ষায় আমরা অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। তবু আরও বহু প্রশ্ন রেখে এই পুস্তিকা শেষ হল। এই প্রশ্নগুলির উত্তর, এই সমস্যার বর্তমান চিত্র অনুসন্ধান করা আমাদের সবার কাজ।

দুটি কথা.....

এই প্রতিবেদন একটি পেশাজাত ব্যাধি সম্বন্ধে। লোকবিজ্ঞান সংগঠনের মতে পেশাজাত ব্যাধির সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে শিল্পের বিকাশ অত্যন্ত দ্রুতহারে ঘটে চলেছে। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মানুষ শিল্প-উদ্যোগগুলিতে কাজ করছে। পেশাজাত ব্যাধি সম্বন্ধে জনসাধারণের জ্ঞান অত্যন্ত কম। অনেক ডাক্তার-ই এ সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিফহাল ন'ন। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সব পেশাজাত ব্যাধির উপশম কি ভাবে করা যায় ? এটা শুধু বিশেষজ্ঞদের সমস্যা নয়—এতে ডাক্তার, উকিল, কারখানার ম্যানিজার, শ্রমিক, কারখানা পরিদর্শক, ট্রেড ইউনিয়ন প্রত্যেকের নিজস্ব ভূমিকা আছে।

লোকবিজ্ঞান সংগঠন সর্বস্তরের মানুষের কাছে এই পুস্তিকা সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জানাবার আবেদন রাখছে যাতে এই সমস্যাটিকে যথেষ্ট গভীর-ভাবে জানা ও বোঝা যায়।

মূল হিন্দী পুস্তিকা মহারাষ্ট্র লোক বিজ্ঞান সংগঠনের পক্ষে বৃজমোহন অরোড়া, সঞ্জয় সঞ্জীবনী বহো কর্তৃক রচিত।

জৈন, অবিনাশ ধর, পার্থ ভট্টাচার্য, অলক রায়, স্পেল্টা ওয়াদিয়া, রামচন্দ্র শংকর এবং

সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ঃ সুমনা দত্ত ও অমিতাভ দত্ত

প্রগতি বার্তা

বিশেষ গণবিজ্ঞান সংখ্যা (অক্টোবর 1983)—আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন। গণবিজ্ঞান কি ; কি তার উদ্দেশ্য ; কেমন হবে এর বাস্তব রূপরেখা ; গণবিজ্ঞান বিষয়ে অন্যদেশে চিন্তাভাবনা কাজ কি হয়েছে ; এ দেশে, এই রাজ্যে কতটা তৈরী হয়েছে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পটভূমি—এ সবই আজ জরুরী প্রশ্ন। প্রগতি বার্তার এই সংখ্যাটি তাই সময়োচিত ও মূল্যবান।

প্রাপ্তিস্থান

শিয়ালদা নর্থ ষ্টেশন, ডালহৌসি স্কোয়ার টেলিফোন ভবনের সম্মুখে 'ছাড়পত্র', কলেজ স্কোয়ারে 'বুকমার্ক', 'কথাশিল্প', নৈহাটি, সোদপুর, কাঁচড়াপাড়া রেল ষ্টেশন এবং প্রগতিবার্তার অফিস।

প্রগতি বার্তা, অমূল্য মণ্ডল, B৩/119 কল্যাণী 741235

প্রকাশিত হল

* বিষয় জনস্বাস্থ্য/ডঃ সুখময় ভট্টাচার্য/দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ দাশগুপ্ত এ্যান্ড কোং/কলেজ স্ট্রীট

* **উৎস মানুষ**

ফেব্রুয়ারী 1984 সংখ্যায় পড়ুন জনস্বাস্থ্য বিষয়ে নানা লেখা

উৎস মানুষ/BD494 সল্ট লেক/কলকাতা-700064

Read and Subscribe for

PARENTS & PEDAGOGUES

The first **news magazine** of its kind in India for concerned parents, committed teachers and all those who are disturbed over our present state of education for children and adolscents.

Address : B—22/8 Karunamoyee Housing Estate, Salt Lake Cal-700064

Also available at : Chharpatra (opposite to telephone Bhawan), Bookmark, Kathasilpa

জনস্বাস্থ্য ও জনবিজ্ঞান তথ্যকেন্দ্র

সমাজ, বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ে কাটিং পত্র-পত্রিকা পুস্তিকা রিপ্রিন্ট রাখা হয়। আপনিও এই প্রচেষ্টার অংশীদার হোন। আপনার সংগৃহীত পত্র-পত্রিকা জমা দিয়ে সাহায্য করুন।

c/o প্রসেনজিৎ স্মৃতি স্বাস্থ্য কেন্দ্র

11E হেমচন্দ্র নস্কর রোড (বেলেঘাটা সি আই টি মোড়ে রত্না কেবিন স্টপেজ)।

খোলা থাকে—প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টা।

রিপোর্ট

রায়গঞ্জে বিজ্ঞান প্রদর্শনী

গত 18ই, 19শে ও 20শে নভেম্বর রায়গঞ্জ বিজ্ঞান ক্লাব ও স্থানীয় ডি কে.সি. ক্লাবের যৌথ প্রচেষ্টায় এক উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়ে গেল। উল্লেখযোগ্য দুটো কারণে,—প্রথমত এই ধরণের বিজ্ঞান প্রদর্শনী রায়গঞ্জে এই প্রথম, দ্বিতীয়ত উপলক্ষটা ছিল কার্তিক পুজো। [অর্থাৎ কিনা একদিকে "বিজ্ঞান" অন্যদিকে অবৈজ্ঞানিক চিন্তায় লালিত "পুজো উৎসব"। জানিনা পুজোকমিটির কারো কারো মাথায় হঠাৎ একটা চমক সৃষ্টি করার ইচ্ছে ছিল কিনা।]

এই উপলক্ষে যা ঘটল তা সত্যিই বেশ আশা জাগায়। কারণ এই বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ছিল আশপাশের কয়েকটা বিদ্যালয়, বি. টি. কলেজ ও অন্যান্য কয়েকটা বিজ্ঞান ক্লাবের দেওয়া কিছু মডেল,—যাতে ছিল বর্তমান শক্তি সমস্যা, জিন্ প্রযুক্তি বিদ্যার সু ও কুফল, পরিবেশ সমস্যার বিভিন্ন দিক। ছিল গন-বিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্রের দেওয়া "খরা", "কুসংস্কার ও আমরা" ও বর্তমান চলতি ওষুধের বিভিন্ন দিকের উপর লেখা সচিত্র পোষ্টার। আর ছিল বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর চিত্র-প্রদর্শনী ও স্লাইড বক্তৃতা। বিজ্ঞান পত্রিকার স্টলে প্রচুর লোক সমাগম বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

সবচেয়ে ভাল লাগল এই প্রদর্শনীকে ঘিরে বিভিন্ন বিজ্ঞানক্লাবের বন্ধুদের মধ্যে মেলা মেশা, অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের ব্যাপারটা।

—শান্তনু ত্রিবেদী

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি

আপনাদের গ্রাহকপদের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার এক সংখ্যা আগে আপনাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়। সাথে সাথে গ্রাহকপদ নবীকরণ করুন। ফেলে রাখলে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

টাকা মনি অর্ডার মারফৎ অভিজিৎ লাহিড়ী, EC106 সল্টলেক কলকাতা 700064 এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফটও পাঠাতে পারেন।

বিঃদ্রঃ পোস্ট অফিসের নিয়মতান্ত্রিকতার ওজরে কিছু কিছু গ্রাহকদের প্রেরিত মনি অর্ডার ফেরৎ গেছে বলে জানতে পারলাম। এজন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। পুনরায় মনি অর্ডার করতে অভিজিৎ লাহিড়ী EC106, সল্টলেক, কলি 700064 এই ঠিকানা লিখুন। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর জন্য এই টাকা কিনা তা তলার স্লিপে লিখুন। সঃ মঃ বি-ও-বি

যে সমস্ত পত্রিকা "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর" দপ্তরের নিয়মিত আসে

* প্রগতিবার্তা * উৎসমানুষ * অঙ্কুরে শুরু * অহল্যা * অন্বেষা * বিজ্ঞান মনীষা * জ্ঞান বিচিত্রা * অনীক * Bulletin of the Association of Scientifec Workers of India * Parents and pedagogues * Scienee for the people * প্রতিবাদী চেতনা * সর্বহারার মুক্তি * লোকবিজ্ঞান * জন বিজ্ঞান।

এদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন

1956 সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের 4 নং অনুযায়ী ফরম বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার নাম—বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

প্রকাশনার ভাষা—বাংলা ও ইংরেজী

প্রকাশনার স্থান—52/9C বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা 700012

প্রকাশকের কাল—দ্বিমাসিক

প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—রবীন মজুমদার, ভারতীয়, কেমিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, 92, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি—700009.

মুদ্রকের নাম ও ঠিকানা—ঐ

সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—ঐ

প্রেসের নাম ও ঠিকানা—ইটারনিটি প্রিন্টার্স, 8, ডঃ আশুতোষশাস্ত্রী রোড, কলিকাতা 700010

আমি, শ্রীরবীন মজুমদার, ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত বিবৃতি আমার জ্ঞান ও বিবরণ মতে সত্য।

স্বাঃ ররীন মজুমদার
প্রকাশক
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকা

দেখুন! শুনুন! নিরাপদে চলুন!

প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রশিংগুলি দেখেশুনে পার হোন

প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রশিংগুলির কাছে এলে একটু সাবধান হোন। দেখে নিন কোন ট্রেন আসছে কি না, কিংবা কোন ট্রেন আসার শব্দ শোনা যাচ্ছে কি না! মাত্র দু'এক মুহূর্তের ব্যাপার—অথচ দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এরই মূল্য কিন্তু অপরিসীম। জানেন তো, কথাতেই বলে সাবধানতার মার নেই।

পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

পূর্ব রেলওয়ে

ER/CAS.-1/81 BEN

R.N. 34929/79

VIGYAN-O-VIGYANKARMI
C/o D.S. Enterprise, 52/9C B. B.
Ganguli Street, Calcutta-700012

YEAR 7 NUMBER 4

JAN-FAB 1984

ঘোষণা

অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যায় পূর্ব ঘোষণা মত "মহারাষ্ট্রে গণবিজ্ঞান আন্দোলন" এই বিষয়ের আলোচনাটি প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যায় থাকছে। এছাড়া থাকবে পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন ও গণবিজ্ঞান আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা। অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ যেমন থাকে থাকবে।

পড়ুন ও পড়ান

উৎস মানুষ ☐ প্রগতিবার্তা (কল্যাণী) ☐ বিজ্ঞান মণীষা (মেদিনীপুর) ☐ অঙ্কুরে শুরু ☐ লোকবিজ্ঞান (কাশীনগর) ☐ অন্বেষা ☐ অহল্যা ☐ গণস্বাস্থ্য (বাংলাদেশ) ☐ Manushi (দিল্লী) ☐ Parents and Pedagogues (উড়িষ্যা) ☐ Science for the People (U S A) ☐ Medico Friends circle Bulletin (পুণে) ☐ জনবিজ্ঞান (আসাম)।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পুস্তিকা

☐ মনোরোগ, মনোরোগী, মনোচিকিৎসা ও একটি নতুন পথের খোঁজে ('উৎস মানুষ' ও 'মানস' এর যৌথ উদ্যোগে প্রচারিত ও মুদ্রিত , যোগাযোগ P 239 A কিষ্বার স্ট্রীট, কলিকাতা—700017) ☐ কল্যাণী ঘোষপাড়ার সতীমার মেলা ও কর্তাভজা সম্প্রদায়—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার, 23, চাঁদমারী রোড, কাঁচরাপাড়া) ☐ মালা বাড়ে রোগ সারে—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (উৎস মানুষ, বি ডি 494 সল্ট লেক, কলি-64) ☐ গণবিজ্ঞান আন্দোলন কি ও কেন, একটি প্রাথমিক খসড়া—মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার (অমূল্য মণ্ডল কর্তৃক বি6/119 কল্যাণী, নদীয়া থেকে প্রকাশিত) ☐ পরিবেশ দূষণ : মানুষ—স্বপন কুমার শীল (কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবার) ☐ পরিবেশ দূষণ : সমস্যার সমাধান সম্ভব—ঐ ☐ কারেন সিল্কউড—নিউক্লিয়ার চক্রান্তের শিকার (মহিলা পাঠাগার, 57 বি পিয়ারীমোহন রায় রোড, চেতলা, কলি 27) ☐ হিরোসিমা নাগাসাকি চাই না—সৌমেন গুহ।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী কোথায় পাবেন

☐ কলেজ স্কোয়ারের বইয়ের দোকান 'কথাশিল্প', 'বুকমার্ক', 'পিপ্‌লসবুক সোসাইটি' ☐ শিয়ালদহ নর্থ স্টেশন ☐ বি. বি. ডি বাগের স্টল 'ছাড়পত্র', 'এমা' ☐ শ্যামবাজার ও রাসবিহারী মোড়ের স্টল ☐ রাজা রামমোহন রায় সরণী, শ্রদ্ধানন্দ পার্কের উল্টোদিকের বইয়ের দোকান 'নবসাহিত্য প্রকাশনী' ☐ এবং অন্যান্য।

রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে গীতা প্রিন্টার্স, ২১ পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত